দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে
দাওয়াতের নিয়তে
পয়গামের প্রকাশ...

৪র্থ সংখ্যা
জুমাদাল উলা ১৪৪৫ হিজরি
নভেম্বর ২০২৪ ইংরেজি

ষান্মাসিক

ফারুক্বী পয়গাম

Faruqi Poygam

জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদরাসা নবীগঞ্জ হবিগঞ্জ

JAMIA FARUQIA TAJPUR NABIGANJ HABIGANJ

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম: শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুক্বী

জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদরাসা

কাজীগঞ্জ বাজার, ৭নং খরগাঁও, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ

ভূমিকা

ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ন জীবন ব্যবস্থা আর কোরআন হচ্ছে এই জীবন ব্যবস্থার সংবিধান, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিয়ে মহান আল্লাহপাক এই কোরআন শরীফ নাযিল করেছেন, তারপ্রিয়, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের উপর মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর"কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আজ ইসলামের পরিপূর্ণ ও প্রকৃত রুপের অনুশীলন ও বাস্তবায়ন আমাদের মধ্যে তেমন দেখা যাচ্ছে না। এ সকল লক্ষ ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে এবং পরিপূর্ণ ঈমানদার হিসাবে আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তোলারঅভিপ্রায়ে আমাদের তাজপুর (মাধুবপুর) এলাকায় একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাই বিবেকের তাড়নার ফসল এই জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা।

"কবুল করহে মোদের এই জামেয়া ওগো দয়াময়
সাহায্য ভিক্ষাচাহি-প্রভূ তোমার, সব সময়"।

আকুল আবেদন

আসসালামু আলাইকুম

বেরাদ্বারানে মিল্লাত,

আল্লাহর অশেষ দয়া ও ফজলে জামেরা ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদরাসা ২০০৪ ইংরেজিতে প্রতিষ্টালাভ করে। আজ পযর্ন্ত দ্বীনদার মুসলিম ভাই-বোনদের আর্থিক সহযোগিতায় ও দোয়ায় ইলমে, দ্বীনি প্রতিষ্টানটি পরিচালিত হয়ে আসছে। সর্বস্তরের মুসলিম জনসাধারনের প্রতি আকুল আবেদন এই যে, আপনাদের লিল্লাহ যাকাত, ফিতরা, কুরবানির পশুর চামড়া বা টাকা ও অন্যান্য দান-সদকা থেকে একটি অংশ অত্র প্রতিষ্ঠানে দানকরে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধন করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে দান করার তৌফিক দান করুন। আমিন!

শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুক্বী

Appeal

Finally, I humbly appeal to all of my muslim brother and sister of all walks of life to generously donate for this good cause. It is my hope that jamia will transform into an Institute of knowledge and practice inshaAllah .

please kindly donate a portion of your lillah,Zakat ,Sadaqah and Fitra to the madrasah for the welfare of this World and the Hereafter.

Sheikh Abu Taher Faruqi
Founder and Principul

ব্যাংক একাউন্ট	Bank Account
হিসাবনং- ৪২৮৬৭	Ac: no:- 42867
[পূবালীব্যাংক, নবীগঞ্জশাখা]	[Pubali Bank, Nabiganj Branch]
বিকাশ ০১৭২৬০২২৭৭৮ (পার্সনাল)	B-kash: 01726022778 (Personal)

Facebook: jamia faruqia madrasha | Youtube: Faruqi Dawa Channel
E-mail : Jamiafaruqia@hotmail.com | mataherfaruqi@hotmail.com

পৃষ্ঠপোষক
আল্লামা মুখলিছুর রহমান সাহেব কিয়ামপুরী
আল্লামা সাইদুর রহমান সাহেব বর্ণভী
আল্লামা আব্দুশ শহিদ সাহেব চাম্পারকান্দী
শায়খুল হাদীস মাওঃ রুহুল আমিন সাহেব
হযরত মাও. শামসুদ্দিন, ইউ.কে

উপদেষ্ঠা মন্ডলী
মুফতি সাইফুল ইসলাম, ইউ. কে.
হযরত মাওলানা বাহাউদ্দীন সাহেব
মুফতি মাও. হাসান নুরী চৌধুরী, ইউকে
হাফেজ মাও. মাসরুরুল হক, হবিগঞ্জী
হযরত মাওলানা নূরুল হক নবীগঞ্জী

প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক
শায়খ মাওঃ আবু তাহের ফারুক্বী (দা.বা)

নির্বাহী সম্পাদক
হা. মাও. মোসতাক আহমদ ফারুক্বী

সহ. সম্পাদক
মাও. হোসেন আহমদ ফারুক্বী

প্রকাশনা সম্পাদক
মাও. মোজ্জাম্মিল হক
মাও. আল আমিন

কম্পোজ
মাষ্টার ইউনুছ আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
মাও. নুরুল হক

সৌদি আরব প্রতিনিধি
মাওঃ নাজমুল ইসলাম সাদীক

প্রচ্ছদ: ইনাম বিন সিদ্দিক
ইলাস্ট্রেশন: আব্দুল মুমিন
মুদ্রণ
কাতিব মিডিয়া, সিলেট

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০২৪

সৌজন্যে
মাওলানা নুরুল হক [ইউকে]
মাওলানা হুসেন আহমদ ফারুকী [ইউকে]

মতভেদ আর দলাদলি
পায়ের নীচে দেব ফেলি
মধুর টানে তান ধরিবো
ইল্লাল্লার আজান!
পাগল হয়ে নামবো মোরা
করবো পাগল বিশ্বসারা
জানাই দিবো জগৎটাকে
আমরা মুসলমান!!
-শায়খ বর্ণভী রহ.

সূচিপত্র ঃ

সম্পাদকীয়
বাণী
দারসে কুরআন
দারসে হাদিস
নির্যাতিত মুসলিম জাতী ও আমাদের করণীয়
রক্তাক্ত ফিলিস্তিন
নবীজি সা. এর শেষ ভাষণ ও ইন্তেকাল
উত্তম চরিত্র
আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী
কুরআন শিক্ষার ফজিলত ও গুরুত্ব
সীরাত চর্চা সাহাবায়ে কেরাম ও আমরা
তাওবার গুরুত্ব ও ফজিলত
অন্তরে চিন্তা ভাবনার প্রকারভেদ এবং মন্দ চিন্তা থেকে
বেঁচে থাকার উপায়
আমাদেরকে নেক এবং এক হতে হবে
আত্মার পরিশুদ্ধি ও তার গুরুত্ব
ইসলাম ও মানবাধিকার
তালিবুল ইলমদের রমাযান
শিক্ষকের মর্যাদা
ধৈর্য ও নামাজ যাবতীয় সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকার
কবিতা কানন
জামিয়ার ইতিবৃত্তান্ত
এক নজরে জামিয়া
যে সমস্ত মনিষীদের পদচারনায় জামেয়া ধন্য

সম্পাদকীয়

এক. ফারুক্বী পয়গাম ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশনার সূচনা লগ্নে সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তালার-যার অফুরন্ত নিয়ামতের পরশে সৃষ্টি জগৎ বিমোহিত, এবং অগণিত সালাম, সালাত পথহারা মানুষের পথের দিশারী নবী কুলের সর্দার, দু'জাহানের বাদশা আখেরি নবি হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর।

দুই. মুসলিম জাতি আজ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। মুসলমানদের প্রাণাধিক প্রিয় একক ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন রাসূলে আকরাম ﷺ । রাসূলের ভালবাসা শুধু আবেগ নয়, বরং শরিয়তও। রাসূলের ভালবাসা পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, সহায়-সম্পদ এমনকি নিজের প্রাণের চাইতেও রাসূল ﷺ কে ভালোবাসতে পারলেই কেবল ঈমান পূর্ণ হওয়া সম্ভব । সেই ব্যক্তিত্বের শানে যখনই আঘাত আসবে, তখনই সাথে সাথে মুসলমানরা ক্ষোভে-প্রতিবাদে ফেটে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। এটা শরিয়তের অংশ, এটা ঈমানের দাবি।

সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে ভারতের হিন্দু ধর্মীয় নেতা কর্তৃক রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তার সম্মানিত পরিবার নিয়ে কুরুচিপূর্ণ কটূক্তির প্রতিবাদে রাসূলের ভালোবাসায় ঈমানী আন্দোলনের জোয়ার উঠেছিল। প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের মুসলিমরাও স্ব স্ব অবস্থান থেকে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে পবিত্র কোরআনে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল ﷺ এর মর্যাদায় আঘাত আসলে খোদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লাও বরদাস্ত করেন নাই। আবু লাহাব যখন রাসূলে আকরাম ﷺ এর ধ্বংস কামনা করল, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন তার প্রতিবাদে "সূরা লাহাব" নামে পুরা একটি সূরা নাজিল করেন। আল্লাহ বললেন- ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয়,। মুশরিকরা যখন রাসূলে আকরাম সঃ কে নির্বংশ বলে কটাক্ষ করল, তখন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন "সূরা কাউসার" নামে আরেকটি সূরা নাযিল করেন। ঘোষণা দিলেন- যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা নির্বংশ। হাফিজ ইবনে তাইমিয়া রহ : লিখেন- যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে গালি দিবে, সে মুসলিম হোক বা কাফের, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

তিন. আধুনিক ইলেক্ট্রিক অনলাইন মিডিয়ার যুগে লেখনীর মাধ্যমে যাতে ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস ফুটে উঠে, সে মহান লক্ষ্যেই সাহিত্য চর্চার এক পাঠশালা হিসাবে ফারুক্বী পয়গামের যাত্রা । এতে প্রয়োজন পাঠকদের সুপরামর্শ, আন্তরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা । আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণাই হবে ফারুক্বী পয়গামের আগামীর পথ চলা।

বাণী

শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুক্বী সাহেব

حامدا و مصليا و مسلما، أما بعد

হক বাতিলের সংঘাত চিরকালের। সত্য, সুন্দর ও কল্যানের অগ্রযাত্রায় বাতিল পন্থিদের প্রতিবন্ধকতা এবং হক পন্থিদের প্রাণান্ত মুজাহাদা নিয়েই রচিত দুনিয়ার ইতিহাস। মুসলিম জাতির গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস ও দ্বীনি শিক্ষার দাওয়াত জাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার দু'টি মাধ্যম রয়েছে। এক. মৌখিকভাবে দুই. কলম ও লেখনীর মাধ্যমে। একজন মানুষ তার ভাবাবেগ তথা মতবাদকে লেখনীর মাধ্যমে জাতির কাছে পৌঁছে দিতে যতটুকু সক্ষম হয়, অন্যকোনো মাধ্যমে ততটুকু সক্ষম হয় না। লেখনীর মাধ্যমেই ইমাম বুখারী, মুসলিম, গাযালী, রাযী, থানভীসহ (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমূখ মহা মনীষীবৃন্দ মরেও অমর হয়ে রয়েছেন। তাই মৌখিক দওয়াতের পাশাপাশি কলমী দাওয়াতেও অগ্রগামী থাকা অপরিহার্য।

ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন ও জামিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে জামিয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিতব্য এ স্মারক গ্রন্থটি নিশ্চয়ই সময়োপযোগি একটি মহতী প্রচেষ্টা। দু'আ করি আল্লাহ পাক যেন এ মহতী কাজে অংশগ্রহণকারী এবং জামিয়ার প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে অদ্যাবধি ত্যাগী, সহযোগী সকলকে জাযায়ে খায়র দান করেন, এবং জামিয়ার উস্তাদবৃন্দ ও তালাবাদেরকে কোরআন ও সুন্নাহের ধারক ও বাহক হিসাবে কবুল করে নেন এবং জামিয়াকে তার সঠিক লক্ষ্যপানে পৌঁছিয়েদেন। আমীন!

বাণী

মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব

আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া, এবং অসংখ্য অগণিত দূরুদ ও সালাম নবি কুলের সর্দার মুহাম্মাদুর রাসূল (সা) এর উপর। ফারুক্বী পয়গাম ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় অত্যান্ত খুশি হয়েছি। ফারুক্বী পয়গাম মানেই কুরআনী দর্শন, ফারুক্বী পয়গাম মানেই ওমরী দর্শন। আজ যদি মুসলিম বিশ্ব ফারুক্বী পয়গামের বাস্তবায়ন করত তাহলে বিশ্বের মানচিত্রে মুসলিম জাতি মাথা উচু করে দাড়াতে পারত। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আজ ইউরোপ আমেরীকা সহ উন্নত বিশ্বে ফারুক্বী পয়গাম বা উমরী দর্শনকে তাদের নামে চালিয়ে দিয়ে তারা আজ বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর আমরা তাদের দাসত্ত্বের শিকলে আবদ্ধ। প্রিয় শায়খ মাওঃ আবু তাহের ফারুক্বীর প্রাণের ইচ্ছা হচ্ছে ফারুক্বী পয়গাম বা ওমরী দর্শন বাস্তবায়ন করা। এই আধুনিক যুগে ফারুক্বী পয়গাম লেখনির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া, এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। আল্লাহ তায়ালা যেন তার এই মেহনতকে কবুল করেন। এবং ফারুক্বী পয়গাম কে যেন দ্বীনী দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে কবুল করেন। আমিন!

দারসে কুরআন

তাফসিরে ইবনে কাসীর গ্রন্থ থেকে সংগ্রহীত

يَاَيُّهَاالَّذِينَ اٰمَنُوااسْتَعِينُوابِالصَّبْرِوَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ

তরজমাঃ সূরা বাকারা (১৫৩) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।

وَلَا تَقُوْلُوا لِمَن يُّقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَل اَحْيَاءٌ وَّلٰكِن لَا تَشْعُرُونَ

(১৫৪) আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা জান না।

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىءٍ مِّنَ الْخَوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِينَ

(১৫৫) এবং নিশ্চই আমি তোমাদেরকে ভয়,ক্ষুধা এবং ধন-প্রাণ ও ফল-শস্যের কোন একটির অভাব দ্বারা পরীক্ষা করব। এবং ঐসব ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।

الَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيهِ رٰجِعُونَ

(১৫৬) যাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা বলে নিশ্চই আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং নিশ্চই আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

اُولٰٓئِكَ عَلَيهِم صَلَوٰتٌ مِّن رَّبِّهِم وَرَحْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

(১৫৭) এদের উপর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শান্তি ও করুনা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথ গামী।

ব্যাখ্যাঃ শুকরিয়ার পর "সবর" বা ধৈর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে নামাযের বর্ণনা দিয়ে এইসব সৎ কার্যকে মুক্তি লাভের মাধ্যম করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষ যখন সুখে থাকে তখন সেটা হচ্ছে শুকরের সময়। হাদীসে রয়েছে- মুমিনের অবস্থা কতইনা উত্তম যে, প্রত্যেক কাজে তার জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে । সে শান্তি লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এর ফলে সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। আর কষ্ট পেলে 'সবর' করে এরও সে একটা প্রতিদান পেয়ে থাকে। এখানে এও বলা হয়েছে যে, বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এবং সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম হল ধৈর্য ও নামায। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ

"তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহার্য্য প্রার্থনা কর এবং নিশ্চই এটা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন কাজ"। হাদিস শরীফে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে যখন কোন কাজ কঠিন বিপদ ও চিন্তার মধ্যে নিক্ষেপ করতো, তখন তিনি নামায আরম্ভ করে দিতেন।

"সবর" দুই প্রকার- প্রথম হচ্ছে নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপর 'সবর' করা। দ্বিতীয় হচ্ছে আনুগত্য ও পুণ্যের কাজ করার উপর 'সবর' করা। আর এ 'সবর' হচ্ছে ১ম 'সবর' থেকে বড়। আরো এক প্রকার ধৈয্য আছে, তা হচ্ছে বিপদ ও দুঃখের সময় ধৈর্য ধারণ করা। এটা ওয়াজিব। যেমন দোষ ও পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করা ওয়াজিব। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন- জীবনের উপর কঠিন হলেও , স্বভাব বিরুদ্ধে হলেও, এবং মনে না চাইলেও ধৈর্যের সাথে আল্লাহ তা'লার আদেশ পালনে লেগে থাকা হচ্ছে এক প্রকার 'সবর'। আর ২য় 'সবর' হচ্ছে প্রকৃতির ও মনের চাহিদা মোতাবেক হলেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ হতে বিরত থাকা।

এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يُوَفَّى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُم بِغَيرِ حِسَاب

অর্থাৎ- ধৈর্যশীলগণ কে তাদের পুর্ণ প্রতিদান সীমাহীন দেওয়া হবে।

হযরত আবু সাঈদ বিন যুবায়ের (রঃ) বলেন-'সবর' হচ্ছে আল্লাহ তা'লার দানকে স্বীকার করা, বিপদের প্রতিদান আল্লাহ তা'লার নিকট পাওয়ার বিশ্বাস রেখে তার জন্য পুণ্যের প্রার্থনা করা, প্রত্যেক ভয়, উদ্বেগ এবং বিপদের স্থলে ধৈর্য্য ধারণ করা এবং পুণ্যের আশায় ওর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অবশ্যই পরীক্ষা করে থাকেন। কখনও পরীক্ষা করেন উন্নতি ও মঙ্গলের দ্বারা, আবার কখনও পরীক্ষা করেন অবনতি ও অমঙ্গলের দ্বারা। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُم وَالصَّابِرِينَ

অর্থাৎ- নিশ্চই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে জেনে নেবো, কে ধর্মযোদ্ধা এবং কে ধৈর্য্যশীল। আল্লাহ আরো বলেন- তিনি তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন। এ সব কিছুর অর্থ হল- সামান্য ভয়-ভীতি, কিছু ক্ষুধা, কিছু ধন-সম্পদের ঘাটতি, কিছু প্রাণের হ্রাস তথা- নিজের ও অপরের, আত্নীয়-স্বজনের এবং বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু, কখনও ফল এবং উৎপাদিত শস্যের ক্ষতি ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। এতে ধৈর্য্যধারণকারীদেরকে তিনি এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এবং অসহিংষ্ণু, অধৈর্য্যশীলকারী, এবং নৈরাশ্যবাদীদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করে থাকেন। এখন আল্লাহ তালার নিকট ধৈর্য্যশীলদের যে মর্যাদা রয়েছে, তারা কোন প্রকারের লোক? আল্লাহ তায়ালা বলেন এরা ঐসব লোক যারা সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় 'ইন্নালিল্লাহ' পড়ে থাকে এবং এ কথার দ্বারা নিজের মনকে সান্তনা দিয়ে থাকে যে, এটা আল্লাহ তালার হাতে রয়েছে। তাকে যা দেওয়া হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছে। তিনি এর মধ্যে ভাল-মন্দ সব করতে পারেন। অতঃপর তাঁর কাছেই এর প্রতিদান রয়েছে যাঁর কাছে সে একদিন ফিরে যেতেই হবে। বান্দার এই উক্তির কারনে

তার উপর মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়, সে শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করে এবং সু-পথ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

হযরত উমর (রাঃ) বলেনঃ সম্মানের দুটি জিনিস 'সালাত ও রহমত' এবং এর মধ্যবর্তী আরেকটি জিনিস রয়েছে তা হল- 'হিদায়াত' এগুলো ধৈর্য্যশীলরা লাভ করে। মুসনাদে আহমদে রয়েছে- হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ একদা আমার স্বামী আবু সালমা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দরবার থেকে আমার নিকট আসেন এবং অত্যান্ত খুশি মনে বলেনঃ আজ আমি এমন একটি হাদিস শুনেছি যা শুনে আমি অত্যান্ত খুশি হয়েছি। ঐ হদিসটি হল এই যে, যখন কোন মুসলমানের উপর কোন কষ্ট ও বিপদ আসে এবং সে পড়ে

اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

তখন আল্লাহ তা'লা তাকে অবশ্যই বিনিময় ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। হযরত উম্মে সালমা বলেন আমি এই দোয়াটি মুখস্থ করে নেই। অতপর আবু সালমার ইন্তেকাল হলে আমি

اِنَّ اللهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

এর সাথে এ দোয়াটিও পড়ে নেই। কিন্তু আমার ধারণা হয় যে, আবু সালমা (রাঃ) এর চেয়ে ভাল লোক আর কাকে পাব? আমার ইদ্দত শেষ হলে আমি একদিন আমার একটি চামড়া ঠিক করতে ছিলাম। এমন সময় রাসুল ﷺ আগমন করেন এবং ভিতরে আসার অনুমতি চান। আমি রাসুলﷺ কে ভিতরে আসার প্রার্থনা জানাই। তাঁকে একটি নরম বিছানায় বসতে দেই। তিনি আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি বলি হে আল্লহর রাসুল ﷺ এটাতো আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের কথা কিন্তু প্রথমত কথা হলঃ আমি একজন লজ্জাবতী নারী। না জানি আমার দ্বারা আপনার স্বভাবের বিপরীত কোন কাজ সংঘটিত হয়ে যায় এবং এরই কারণে আল্লাহ তালার নিকট আমি শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাই।

দ্বিতীয়তঃ আমি একজন বয়স্কা নারী। তৃতীয়তঃ আমার ছেলে-মেয়ে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-দেখ! আল্লাহ তা'লা তোমার এই অনর্থক লজ্জা দূর করে দিবেন। আর বয়স আমারও তো কম নয় এবং তোমার ছেলে-মেয়ে যেন আমারই ছেলে-মেয়ে। আমি একথা শুনে বলি- হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাহলে আমার আর কোন আপত্তি নাই । অতপর আল্লাহর নবীর সাথে আমার বিবাহ হয়ে যায়। এবং এ দোয়ার বরকতে আমার পুর্ববর্তী স্বামী অপেক্ষা উত্তম স্বামী অর্থাৎ- স্বীয় রাসূল ﷺ কে আল্লাহ তা'লা দান করেছেন। সুতরাং সমস্থ প্রশংসা আল্লাহ তা'লার। 'মুসনাদে আহমদ' কিতাবে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- রাসূলু-ল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন কোন মুসলমানকে বিপদে ঘিরে ফেলে, এবং এর উপর যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় অতঃপর আবার তার স্বরণ হয় এবং সে পুণরায় 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করে তবে বিপদে ধৈর্য্য ধারণের সময় যে সওয়াব সে লাভ করেছিল ঐ সওয়াব সে এখনও লাভ করবে। 'সুনানে ইবনে মাজা' কিতাবে হযরত আবু সিনান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে- তিনি বলেনঃ আমি আমার একটি শিশুকে দাফনের কাজ শেষ করি। তখনও আমি তার কবরেই রয়েছি, এমন সময় হযরত আবু তালহা খাওলানী (রাঃ) আমাকে আমার হাত ধরে উপরে উঠিয়ে আনেন এবং বলেনঃ আমি কি আপনাকে একটি সু-সংবাদ দেব না? আমি বলি 'হ্যা' তিনি বলেনঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তা'লা বলেনঃ, হে মরণের ফেরেশতা ! তুমি আমার বান্দার ছেলে , তার চক্ষুর জ্যোতি, এবং তার কলিজার টুকরোকে ছিনিয়ে নিয়েছ? ফেরেশতা বলেন 'হ্যাঁ'। আল্লাহ তা'লা বলেনঃ তখন সে কি বলেছে? ফেরেশতা বলেনঃ সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করেছে। তখন মহান আল্লাহ বলেনঃ তার জন্যে বেহেশতে একটি ঘর তৈরী কর এবং ওর নাম ' বায়তুল হামদ' বা প্রশংসার ঘর রেখে দাও।

অযোগ্য লোককে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেয়া চরম দায়িত্বহীনতা।
আল্লামা শেখ সাদী রহ.

দারসে হাদীস

চল্লিশ হাদীসের তাৎপর্য

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম দাঃ বাঃ

শায়খুল হাদিস ও মুহতামিম
আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাখজানুল উলূম ঢাকা

عن ابى الدرداءؓ قال رسول الله ﷺ ماحدالعلم الذى اذابلغه الرجل كان فقيهافقال رسول الله ﷺ من حفظ على امتى الربعين حديثافى امردينهابعثه الله فقيهاو كنت له يوم القيامة شافعا و شهيدا

অর্থঃ হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল হে আল্লাহর রাসূল সা. ইলমের কোন স্তরে পৌছালে কোন ব্যক্তি ফকিহ্ (বিজ্ঞ আলেম) হিসেবে গণ্য হবে? জবাবে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন , যে ব্যাক্তি আমার উম্মতের উপকারার্থে দ্বীনি ব্যাপারে চল্লিশ হাদীস ধারণ বা সংরক্ষণ করে অর্থাৎ মুসলমানদের নিকট পৌছে দেয়। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে ফকীহ্রূপে উঠাবেন এবং ক্বিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। (মিশকাতুল মাসাবিহ্ খন্ড ১)

বর্ণিত হাদীসের শব্দ বিশ্লেষণঃ

من حفظ على امتى الربعين حديثامن امردينهابعثه الله يوم القيامةفى زمرةالفقهاء و العلماء

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপকারার্থে দ্বীনি ব্যাপারে চল্লিশটি হাদিস সংরক্ষণ করার মাধ্যমে উম্মতের নিকট পৌছে দেয়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে ফকিহ ও আলেমদের দলভূক্ত করে উঠাবেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে- بعثه الله فقيهاعالما

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাকে ফকিহ ও আলেমরূপে উঠাবেন। হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে

قيل له ادخل من اى ابواب الجنة شئت

অর্থাৎ চল্লিশ হাদিসের সংরক্ষণকারীকে বলা হবে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর। হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে

كتب فى زمرةالعلماء،وحشرفى الشهداء

অর্থাৎ তাকে আলেমদের দলভূক্ত করা হবে এবং তার হাশর হবে শহীদগণের সাথে। (আল ওয়াফী পৃ৫) হাদীসের বর্ণনাকারীগণঃ আমি যে হাদীসটি উল্লেখ করেছি তা হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্নিত। এছাড়া হযরত আলী রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হযরত আবু হুরায়রা রা. ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. প্রমূখ সাহাবায়ে করাম রা. থেকেও উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। চল্লিশ হাদিস জমা ও প্রচারকারীগণঃ বহু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম উল্লেখিত ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে আল আরবাউন বা চল্লিশ হাদীস জমা ও প্রচার করেছেন। তাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে সর্ব প্রথম কিতাব রচনা করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. মুহাম্মদ ইবনে আসলাম আত তুসী আল আলেমুর রব্বানী রহ. আল হাসান ইবনে সুফিয়ান আন নাসাঈ রহ. আবু বকর আল আজরী রহ. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম আল ইস্পাহানী রহ. আল হাকেম রহ. আবু নুয়াঈম রহ. প্রমূখ ওলামায়েকেরাম। এছাড়া আরো অনেক মুতাক্বাদ্দিমীন (পূর্ববর্তী ওলামায়েকেরাম) ও মুতাআখ্খিরীন (পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম) এ সম্পর্কে কিতাব রচনা করেছেন। যেমন হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. হযরত মুফতী শফি রহ. শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. আর আমি অধমও আরবী ভাষায় আল আরবাউন নামক একটি কিতাব রচনা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! বাংলা ভাষাও বিভিন্ন আমলের ফযীলত সম্পর্কে চল্লিশ হাদীস জমা ও প্রচার করেছি,যেন মানুষের অন্তর আমলের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে আর আখেরাতের পাথেয় অর্জনে সক্ষম হয়।হাদী-সের ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীসে দ্বারা বুঝা যায় চল্লিশ হাদীস সংরক্ষণ করার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাকে হাশরের ময়দানে ফকীহ আলেম তথা দ্বীনের বোধ সম্পন্ন আলেমদের অন্তর্ভূক্ত করবেন এবং রাসূল সা. তার জন্য সুপারিস করবেন ও কল্যানের জন্যে সাক্ষী হবেন। ইমাম নববী রহ. 'সংরক্ষণ'এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন-চল্লিশ হাদীস সংরক্ষণ করার অর্থ হল চল্লিশ হাদীস মুসলমানদের নিকট পৌঁছে দেয়া(হাশিয়ায়ে মেশকাত)

যেমন এরশাদ হচ্ছে:

عن ابن مسعودؓ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول نضرالله امراسمع مناشيأفبلغه كماسمعه فرب مبلغ اوعى له من سامع (رواه الترمذى)

নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান বন্টনকারী আর আল্লাহ অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি ঐ ব্যাক্তির চেহারা হাস্যোজ্জল হোক, যে আমার হাদীস শুনে সংরক্ষণ করেছে এবং হুবহু তা অন্যের নিকট পৌছে দিয়েছে। অত:পর অনেক প্রচারকারী ব্যক্তি শ্রবণকারী থেকেও হাদীসকে অধিক সংরক্ষণকারী সাব্যস্ত হয় (তিরমযী শরীফ) অন্য এক হাদীসে আছে:

عن معاوية قال قال رسول الله ﷺ من يردالله به خيرايفقهه فى الدين وانماانا قاسم والله يعطى (بخارى شريف)

হযরত মুয়াবিয়া রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন আল্লাহ তায়ালা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং তায়ালা তা দান করেন। (বুখারী শরীফ)

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের প্রেক্ষাপট হিসেবে বুঝা গেল প্রত্যেক আলেমে রাব্বানীর উচিৎ তারা যেন আল-আরবাউন তথা চল্লিশ হাদীস জমা করে তা মানুষের নিকট পৌছায়।

নির্যাতীত মুসলিম জাতি আমাদের করনীয়

ড. মাওলানা শুয়াইব আহমদ (ইউ কে)

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রায়ই শুনা যায় মুসলিম নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণা। গতকিছু দিন আগেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গামা বাধিয়ে হিন্দু উগ্র সন্ত্রাসী আর জঙ্গিরা ৩৬ জনমুসলিমকে শহীদ করে দিয়েছে। সহস্রাধীক মানুষকে আহত করেছে। কতটা পাশবিক নির্যাতন হলে ৩৬ জন মুসলিম শাহাদাত বরণ করতে পারে আর সহস্রাধীক মানুষ আহত হতে পারে একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসবে। সেখানে মাসজিদ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মসজিদের মিনারা থেকে মাইক ছুড়ে ফেলে দিয়ে হিন্দুদের প্রতীক গেড়ুয়া পতাকা টানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মসজিদের ইমামদের মুখে এসিড নিক্ষেপ করা হয়েছে, মেয়েদেরকে গণহারে ধর্ষন করা হয়েছে। মোটকথা এমন একটা পরিস্থিতি কায়েম করা হচ্ছে যে, সাধারন মুসলিমরা যেন দিল্লি থেকে স্বেচ্ছায় বের হয়ে যায় এবং তাদের ঘরবাড়ি গুলো যেন দখল করা যায়। একটা হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট যেন প্রতিষ্ঠা করা যায় সেজন্য যত রকমের প্রচেষ্টা আছে সব প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা হচ্ছে। আশ্চর্য্য কথা হলো এই ঘটনার পেছনে কোন মুসলমানের কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি, কোন প্রকার উস্কানি আজো পর্যন্ত কেউ খুঁজে বের করতে পারছেননা। একটাই অপরাধের কথা বলা হচ্ছে যে, তারা নাগরিকত্ব আইনের বিরোধীতা করছেন। অথচ আমরা দেখতে পাই নাগরিকত্ব আইনের বিরোধীতা শুধূ মুসলিমরাই করছেননা বহু হিন্দুরাও করছেন। কিন্তু তান্ডব একচেটিয়া চালানো হচ্ছে শুধুমাত্র মুসলিমদের উপরে।

অতএব এই তান্ডব শুধূমাত্র এইজন্যই যে তারা আলাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন। অন্য কোন কারণ এখানে নেই। এই মহা সত্যটাকেই আলাহ তাআলা দেড়হাজার বছর আগে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল পরাক্রমশালী ও প্রশংসার যোগ্য আলাহর উপর (৮সূরাবুরুজ)

মুসলমান হিসেবে আমাদের অন্তরে যদি সেই কষ্টের দাগ না লাগে, মাসজিদের আগুণের সেই উত্তাপ যদি আমাদের অন্তরে অনুভব না হয়তাহলে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, আমরা নামে মুসলমান ইসলামের কোন ছিটে ফোটা আমাদের অন্তরেবিদ্ধমান নাই। কারণ হাদিসে নবী কারীম সা. বলেছেন:

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়। (সহিহব-খারীহা/৬০১১)

আজ সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা সব চাইতে বেশি মাজলুম। এরপরেও মুসলমানদের শুনতে হয় সন্ত্রাসী আর জঙ্গীর তকমা। মিয়ানমারে শুনতে পাচ্ছি হয় বৌদ্ধ হও না হয় দেশ ছাড়, ভারতের গুজরাটে, দিলিতে শুনতে পাচ্ছি হয় হিন্দু হও না হয় দেশ ছাড়, ফিলিস্তীনে শুনতে পাচ্ছি হয় ইহুদি হও না হয় দেশ ছাড়, চীনে শুনতে পাচ্ছি হয় বৌদ্ধ বা নাস্তিক হও আর না হয় দেশ ছাড়, আফ্রিকা আর ইউরোপের কোন কোন দেশে শুনতে পাচ্ছি হয় খ্রিস্টান হও আর না হয় দেশ ছাড় এই শোগান আজ আমরা পৃথিবীর দিকে দিকে শুনতে পাচ্ছি। মুসলমানরা অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছে এখনো অনেক দেশ মুসলমানরা শাসনকরছে কিন্তু আজো পর্যন্ত কেউ এটা দেখাতে পারবে না যে, কোন মুসলিম দেশে কাউকে বলা হয়েছে যে, হয় মুসলিম হও আর না হয় দেশ ছাড়। এরপরেও এক শ্রেণীর হলুদ মিডিয়া আর বিশ্ব মোড়লরা বলে মুসলমানরাই না কি জঙ্গী আর সন্ত্রাসী। সবচেয়ে অবাক হই যখন দেখি এই হলুদ মিডিয়া গুলো বড় বড় নির্মম মুসলিম ট্রাজেডি গুলোকে এড়িয়ে যায়। এদের দরদ আর মায়া উতলে উঠে অন্যকোন ধর্মের কেউ যখন নির্যাতিত হয় তখন। মুসলমানদের বেলায় এদের মায়া, দরদ আর মানবতা কোন কিছুর উদ্রেক হয়না। ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের কার না জানা আছে (অষ্টম শতাব্দীতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের ভারত শাসনের সূচনা হয় এবং সেটা শেষ হয় ১৭৫৭ সালে এরপরে ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ১৯০ বছর এই ভারত বর্ষকে শাসনকরে খ্রিস্টানরা) ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত মোট ৭৫ বছর পর্যন্ত চলছে হিন্দুদের শাসন। এই ৭৫ বছরের শাসনেই মনে হচ্ছে ভারতবর্ষ মুসলিমদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত নয়। এই ৭৫ বছরে মুসলমানদের উপর যে বব্বর নির্যাতন করা হয়েছে মুসলিম শাসনামলে এর কিঞ্চিত পরিমান জুলুম ও অন্য ধর্মের মানুষের উপর করা হয়েছে এর নজীর কেউ দেখাতে পারবেনা। এই ৭৫ বছরে গুজরাট থেকে শুরু করে আসাম, দিলি এবং কাশ্মীরে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালানো হয়েছে। এখন মুসলিমদের উপর যে নির্যাতনকরা হচ্ছে এই পরিমান জুলুম যদি মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের উপর

করা হতো তাহলে এই ভারতবর্ষে হিন্দুদের নাম নিশানাও খুঁজে পাওয়া যেতনা। এর মানে আমরা তাদেরকে দুধেধুয়া তুলসি পাতা বলছিনা তারাও অন্যায় করেছেন জুলুম করেছেন কিন্তু উগ্র সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী হিন্দুদের মতো নয়।

যেই ইসলাম তার অনুসারী মুসলিমদেরকে শিক্ষা দেয়: لا اِكـرَاهَ فِى الـدِّينِ দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই (সুরা বাকারাঃ ২৫৬) অথচ আজ সেই মুসলিমদেরকেই তাদের আবাস ভূমি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে বিধর্মীদের ধর্মাবলম্বী না হওয়ার অপরাধে। তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের ধর্মত্যাগ করতে, জয়শ্রী-রাম বলতে না হয় তাদেরকে শহীদ করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ ইসলাম এবং মুসলিমদের এমন কোন ইতিহাস নাই যে, তারা কখনো কোন অমুসলিমকে মুসলিম হতে বাধ্য করেছে। এই বব্বরতা এবং এই নিষ্ঠুরতার প্রতিআমরা ঘৃণা জানাই।

আমরা মানুষেরা ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান জানিনা। না জানার কারণে হয়তো আমাদের মুসলিমদের প্রতি তাদের এত বিদ্বেষ। তাই আমরা এখানে ভারত বর্ষে মুসলিমদের কিছু মৌলিক অবদানের কথা কোড করবো। যা বলে গেছেন ড. যোদনাথ সরকার তার লিখিত বই ইসলাম ইন ইন্ডিয়া। (১) বর্হিবিশ্বের সাথে ভারতের তেমন কোন সংযোগ ছিলনা। মুসলমানরাই সর্বপ্রথম ভারতের সাথে বহির্বিশ্বের সূচনা করে।

(২) রাজনৈতীক ঐক্য, সংস্কৃতি এগুলোকে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মুসলিম শাসকেরা। তার আগ পর্যন্ত এগুলো ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিলনা।

(৩) নৌবিহার প্রতিষ্ঠা করেছে ভারতবর্ষে মুসলিমরা। নৌবিহার মুসলিমদের আগেভারতবর্ষে কেউ প্রতিষ্ঠা করেনি।

(৪) সামুদ্রিক বানিজ্যের দ্বার একটা সময়ে ভারবর্ষে ছিল পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এটাকে পূনরুদ্ধার করেছিল মুসলি-মরা।

এর বাহিরে আমরা যদি তাকাই তা হলে দেখতে পারবো ভারতবষের্র গর্ব করার মতো যত বিষয় আছে এর সবগু-লাই মুসলিমদের তৈরী। কুতুবমিনার, দিলিরলাল কেলা, দিলির শাহী জামে মাসজিদ, তাজমহল, বাবরী মাসজিদ এই সব স্থাপত্য শিল্প বানিয়েছে মুসলিমরা আর এগুলোই-ভারত বষের্র গৌরবান্বিত বিষয়। এরপরেও মুসলমানদের নাকি ভারতে থাকারঅধিকারনাই। তাই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে এই সকল মানবতাবিরোধী অপরাধের তীব্র নিন্দা জানাই। মুসলিম হত্যাকান্ডকে যারাই ইনিয়ে বিনিয়ে অস্বীকার করবে তারাই ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে। এছাড়া এই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য মুসলমানদের কি অবদান তা আমরা জানিনা আমাদেরকে জানতে দেওয়া হয়না। আজকের ভারতবষের্র ইতিহাসে মুসলিমদের অবদানের কথা স্বীকার করা হয়না। অথচ ইংরেজ খেদাও আন্দোলনেহিন্দু মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে ইংরেজদেরকে তাড়িয়ে ছিলো। মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরে আরেকজন কাসেম নানুতবী রহ. এই দেওবন্দ মাদ্রাসাটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কি জন্য? আপনি ইতিহাস দেখলে দেখবেন যে সবগুলো ইতিহাসে রয়েছে এই দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয়েছে মূলত ভারতবষের্র স্বাধীনতার জন্য।

এছাড়াও এই ভারত বষের্র স্বাধীনতার পিছনে অনেক মুসলিম মনীষিদের অবদানের কথা দিলির ইন্ডিয়া গেটে লিখা রয়েছে, ইতিহাসে আমরা জানতে পারি যেমন: হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. হাকিম আজমল খান, মুফতি মাহমুদ হাসান রহ. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা আকরাম খাঁ আরো অনেক অসংখ্য উলামায়ে কেরাম ইসলামিক স্কলারগণ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য অবদানই রেখেছেন শুধু তাই নয় বরং মাল্টার জেল খানায় বন্দীদের অধীকাংশই ছিলেন উলামায়ে কেরাম। দিলির চাঁদ নিচক থেকে নিয়ে দীর্ঘ এলাকা পর্যন্ত এমন কোন গাছ ছিলনা যে গাছে আলেমদের লাশ ঝুলে নাই। ইংরেজরা উলামায়ে কেরামদেরেকে জাহাজে ভরে মাল্টার দ্বীপে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে। আজকেও যারা আমার মুসলিম ভাইদেরকেভারত বর্ষে নির্যাতন করছে তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে তাদের মাসজিদগুলোকে আগুণে পুড়িয়ে দিচ্ছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে আলাহর কাছে ফরিয়াদ জানাই আলাহ যেন তাদরেকে চীনের উইঘুরদের উপর নির্যাতনের কারণে যেই শাস্তি পাঠিয়েছেন তাদের উপরে ও এর চেয়ে আরো কঠিন গজব নাজিল করেন। আজকে পুরো পৃথিবীতে মুসলমানদের এরকম দূরাবস্থার কারণ কি? রাসুল সা. হাদিসে বলে গিয়েছেন:

يُوشِـكُ الأُمَـمُ أَنْ تَدَاعَـى عَلَيْكُـمْ كَمَـا تَدَاعَـى الْأَكَلَـةُ إِلَى قَصْعَتِهَـا، فَقَـالَ قَائِـلٌ: وَمِـنْ قِلَّـةٍ نَحْـنُ يَوْمَئِـذٍ؟ قَـالَ: بَـلْ أَنْتُـمْ يَوْمَئِـذٍ كَثِيـرٌ، وَلَكِنَّكُـمْ غُثَـاءٌ كَغُثَـاءِ السَّـيْلِ، وَلَيَنْزَعَـنَّ اللَّـهُ مِنْ صُدُورِ
عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যক্তি বললো, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ কি এরূপ হবে? তিনি বললেনঃ তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে পাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আলাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের পক্ষ থেকে আতঙ্ক দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ভীরুতা ভরে দিবেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আলাহর রাসূল! 'আল-ওয়াহন' কি? তিনি বললেনঃ দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। (আবু দাউদ হা/৪২৯৭)

উক্ত হাদিসে রাসুল সা. মুসলিমপরাজয়ের দুটি বিষয়ের কথা উলেখ করেছেন যা আজ আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মাঝে রয়েছে তাই আমাদের আজ এই দুরাবস্থা।অতএব আমাদের থেকে যদি লাঞ্চনা আর বঞ্চনারগানি মুছতে হয় তাহলে এই দুই অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে তাহলেই হয়তো আমরা আবার ফিরে পেতে পারি আমাদের সোনালি ইতিহাস।

আলাহ তাআলা আমাদেরকে মৃত্যু ভীতি আর দুনিয়ার লোভ থেকে হেফাজতে রাখুন। আমিন!

রক্তাক্ত ফিলিস্তিন

লন্ডন থেকে মুফতি হাসান নূরী চৌধুরী

কিবলা-তাইন থেকে প্যেলিস্তাইন

ফিলস্তিন, গাজা, যুদ্বের পিছনে কি রহস্য নিহিত? অনেক মুসলিম যুব সমাজ মনে করে দেশের নাম যেহেতু ইজরাইল তা হলে ত এটি তাদের ই দেশ, সুতরাং তাদের অপরাধ কি? তাহলে আমদেরকে জানতে হবে এর ইতিহাস, প্রথমতঃ বেল্ফুর নামক ষড়যন্ত্রপূর্বে ইজরাইল নামক দেশের কোন অস্তিত্ত্ব পৃথিবীরমানচিত্রে ছিলনা, বরং আরব তথা মুসলিম উম্মাহের জন্য এটি একটি মরন ফাদ. ভাসমান ইয়াহুদি তথা রিফিউজিদেরকে ইউরোপএবং রাশা থেকে একত্র করে ফিলিস্তিনি মাজলুম মানবতার জন্য মরন ফাদ তৈরি করা হয়েছে, যে সম্পর্কে রাসূলﷺ দেড়হাজার বছর পূর্বে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে ছিলেনযে মরনফাদ একদিন মালহামায়ে কুব্রা বা মালহামায়ে উজমা রূপ ধারন করবে. যা আজ দিবালুকের মতো স্পষ্ট, কিন্তু দুরভাগ্য জনক হলে ও সত্য আরব দুনিয়া আজ ও তা অনুভব করেনি, অথবা বুঝে, শুনে না বুঝার ভান করছে নিজের গতি রক্ষাকরতে অথচ ফিলিস্তিনি মাজলুমরা হচ্ছে তাদের গদির বলির শিকার।কুরআন বলছে, আলাহ রাব্বুল আলামিন সেই মহান সত্তা যিনি তার বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকেমসজিদুল আকসা পর্যন্ত পরিভ্রমন করান। যার আশপাশে রয়েছে অগনিত বারাকাহ এবং নিদর্শন, অর্থাৎ আলাহ তায়ালা বুঝাতেচেয়েছেন উভয় কিবলাহ মুহাম্মাদ সালালাহু আলাহিস সালামের শরিয়াতের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে কারন তার শরিয়াত ই একমাত্র পরিপূর্ন শরিয়াহ বা দিন। এখানেই জায়েনিস্তদের গাত্রদাহ, তাই তারা প্রয়োজনে দুনিয়া ধংসকরে দিবে, তদুপরি মুসলিম উম্মাহের বিজয় মেনে নিবেনা, ইতিহাস এবং কুরআন বলে আলাহ তায়ালা ইবরাহিমআলাইহিস সালামকে বলেন, খলিল আমি তোমাকে অনেক পরিক্ষা নিয়েছি তুমি উত্তীর্ন হয়েছ তুমাকে আমি انی جاعلك لناس اماما জাতির ইমাম বানিয়ে পুরস্কৃত করবো,ইবরাহিম (আ) বলেনঃ- রাব্বে কারিম আমার সন্তানদেরকে তুমি ইমাম বানিয়ে দাও, রাব্বে কারিম বলেনঃ- খলিল তোমার সন্তানদের মধ্যে যারা জালিম হবে তাদের ব্যাপারে আমার ওয়াদা নয়, তা হলে বুঝা যাচ্ছে হযরত ইব্রাহিম (আ) সন্তানদের মধ্যে ইমাম হবেন এবং জালিম তথা জায়েনিস্ত হবে, এই সমস্ত জালিমরাইসুচনা থেকেই তা মেনে নিতে পারেনি। যেমন, আলাহ তায়ালাহযরত ইয়াকুব (আ) সালামের সন্তানদের মধ্যে হযরতইউছুফ (আ) কে ইমাম হিসেবে নিয়োগ করেন কিন্তু তারা তা মেনে নিতে পারেনি, তারা হযরতইউছুফ (আ) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তাকে কুপে ফেলে দেয়া এবং গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা ইত্যাদি, আরো আশ্চয্যের বিষয় হচ্ছে এই জালিমরা এতই হিংশুক যে, এতো নিয়ামত ভোগ করার পরে ও তারা তাদের নাম ইব্রাহিমি, ইয়াকুবি,ইউছুফি,বা দাওদি নাম করেনি বরং তাদের নাম রেখেছে ইয়াহুদি অর্থাৎ তারা আলাহ তালার দেয়া ইমামকে মেনে নিতে পারেনি, কারন তারা জালিম বা জবরদখল কারী, যে ভাবে আলাহ তায়ালা যুগে-যুগে ইব্রাহিম আলাহিস সালামের সন্তানদেরকে ইমামতির আসনে সমাসিন করেছেন, যেমন ইউছুফ আলাহিসসালাম, তালুত রাহিমাহুলাহ, দাউদ ও সুলাইমান আলিহিস সালাম এবং জুলকারনাইন রাহিমাহুলাহ, পরিশেষে মুহাম্মাদ ﷺ এবং ইমাম মাহদি ও ঈসা(আ) এর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটবেইনশাআলাহ, অথচ এই জালিম গোষ্টি সবসময়ই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছে, যেমনঃ- জালুত, বুখতে নসর, সামেরি, কারুন,হামান, পরিশেষ তারা দাজ্জাল কে নিয়ে পৃথিবীতে শাসনের স্বপ্ন দেখছে, আর এ কারনেই আজ মাজলুম ফিলিস্তিনিদের উপর এতো অমানবিক নির্যাতন,নিপীরন, হত্যাজজ্ঞ চালাচ্ছে। অথচ মুসলিম উম্মাহ মুখে কুলুপ এঁটে বসে তামাশা দেখছে, তবে যেনে রাখা ভাল আলাহ তায়ালা জালিমদের ছাড় দেন ছেড়েদেন না, জালিম এবং তাদের সহযোগীদেরধ্বংশ অনিবার্য তা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র,দোয়া করি আলাহ তায়ালা মাজলুম ফিলিস্তিনি সহ সারা দুনিয়ার মাজলুম উম্মাহকে হিফাযাত করুন, সাথেসাথে কিবলা-তাইন হেফাজত করুন এবং সেই দিনের অপেক্ষায় আছি রহমতে আলমেরঘোষনা এমন এক দিন আসবে যে পাথর, গাছপা-লা, লতা, গুল্ম বলবে আমার আড়ালে জালিমের বাচ্ছা লুকিয়েছে তাকে হত্যা কর, এক কথায় প্রকৃতি ও তাদের বিদ্রুহি হয়ে উঠবে, نصرمن الله وفتح قريب

নবিজির শেষ ভাষণ ও ইন্তেকাল

মাওলানা ইলিয়াস মশহুদ (আমেরিকা)

১১ হিজরির ২৮ সফর বুধবার রাতে নবিজি সা. বাকিয়ে গারকাদ কবরস্থান জিয়ারতে যান এবং কবরবাসীদের জন্য দোয়া করেন। দোয়ায় তিনি বলেন, হে কবরবাসী! তোমাদের বর্তমান অবস্থা এবং কবরের অবস্থা কল্যানকর হোক। কেননা, পৃথিবী এখন থেকে ফিতনার আধারে ছেয়ে যাবে। জিয়ারত শেষে ফেরার পর নবিজির মাথা ব্যথা শুরু করে। এরপর জ্বরও চলে আসে। (সিরাতে ইবনে হিসাম) বিশুদ্ধ বর্ণনাঅনুযায়ী এই জ্বর ১৩ দিন স্থায়ী ছিল এবং এ অসুস্থতায় তিনি ইন্তেকাল করেন। (ফাতাহুল বারি) অসুস্থতার এ সময়ে তিনি প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী স্ত্রীদের ঘরে যাতায়াত করেন। তবে অসুস্থতা যখন বেড়ে যায়, তখন স্ত্রীদের কাছ থেকে এভাবে অনুমতি নেন যে, অসুস্থতার দিনগুলো তিনি আয়েশা রা. এর ঘরে থাকতে চান। ফলে সবাই তাকে অনুমতি দেন এবং তিনি আয়শা রা. এর ঘরে অবস্থান করতে থাকেন।

নবিজির অসুখ ক্রমেই বাড়ছিল এবং এক পর্যায়ে মসজিদেও যেতে পারছিলেন না। সে সময় তিনি আবু বকর সিদ্দিক রা. কে নামাজের ইমামতি করতে নির্দেশ দেন। আবু বকর রা. নবিজির জীবদ্দশায় প্রায় ১৭ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করেন। (মিরকাত শারহে মিশকাত) ঘটনাক্রমে একদিন আবু বকর রা. ও আব্বাস রা. আনসার সাহাবিদের এক বৈঠকের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন তারা দেখতে পান উপস্থিত সবাই কাদছেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, আমরা নবিজির মজলিসের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। আব্বাস রা. তাঁদের এই অবস্থার কথা নবিজিকে জানান। তিনি তখন আলী ও ফজল ইবনে আব্বাস রা. এর কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে বের হন। আব্বাস রা. তার আগে আগে যাচ্ছিলেন। নবিজি মিম্বরে উঠতে চাইলেও অসুস্থতার কারণে উঠতে পারেননি। ফলে প্রথম সিঁড়িতে বসে পড়েন। এ সময় তিনি উপস্থিত সাহাবিদের সামনে অলংকারপূর্ণ এক ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন, হে লোক সকল, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা তোমাদের নবির মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় করছ। তোমাদের জানা থাকা চাই আমার আগে কোন নবি কি চিরকাল থেকেছেন যে, আমিও থাকব? হ্যাঁ, আমি আমার মহান রবের সঙ্গে শীগ্রই মিলতে যাচ্ছি এবং তোমরাও আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তবে তোমাদের সঙ্গে আমার মিলনের স্থান হচ্ছে হাউজে কাউসার। অতএব, যে এটা পছন্দ করে যে, কিয়ামত-দিবসে সে হাউজে কাউসারের পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে, সে যেন আপন হাত ও মুখ কে অনর্থক কাজ ও অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত রাখে। আমি তোমাদেরকে তোমাদের মুহাজির ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং মুহাজিররা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা ও সদাচরণের অসিয়ত করছি। নবিজি আরও বলেন, মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে, তখন তাদের শাসকরাও তাদের সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে। আর যখন তাঁর নির্দেশ অমান্য করে, তখন তাদের শাসকরাও তদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করে। (সিরাতে মুহাম্মদিয়া)

সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ন এই ভাষন প্রধানের পর রাসূল সা. ঘরে ফিরে আসেন। ইন্তেকালের পাঁচ অথবা তিন দিন আগে আবারও তিনি ঘরের বাহিরে বের হন। তখন তাঁর মাথায় পট্টি বাধা ছিল। মসজিদে তখন আবু বকর রা. জুহরের নামাজের ইমামতি করছিলেন। নবিজির আগমন টের পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে থাকলে তিনি তাঁকে হাতের ইশারায় নিষেধ করেন এবং নামাজ চালিয়ে যেতে বলেন। এর পর তিনি আবু বকরের বাম পাশে বসে পড়েন। নামাজ শেষ হলে মুসল্লিদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন, আমার প্রতি আবু বকরের অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বানাতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধু বানাতাম, কিন্তু আল্লাহ ছাড়া যেহেতু আমার কোন খলিল হতে পারে না, তাই আবু বকর আমার ভাই ও বন্ধু। নবিজি আরও বলেন, আবু বকরের দরজা ছাড়া মসজিদে আর যত দরজা রয়েছে সব বন্ধ করে দাও।

আল্লামা ইবনে হিব্বান রাহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এ হাদিসে স্পষ্টভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবিজির পর আবু বকরই খলিফা হবেন। (ফাতহুল বারি)

২ রবিউল আউয়াল সোমবার। সে দিন আবু বকরের ইমামতিতে লোকেরা ফজরের নামাজ পড়ছিল। এ সময় হঠৎ করে রাসূল সা. আয়েশা রা. এর কক্ষের পর্দা সরিয়ে লোকেদের নামাজ পড়তে দেখে মুচকি হাসেন। আবু বকর রা. বিষয়টি টের পেয়ে পেছনে সরে আসতে লাগলেন। তখন আনন্দের আতিশয্যে সাহাবিদের মনও নামাজের মধ্যেই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। জনৈক কবি বলেন, "নামাজে নত হলেই তোমার চেহারা ভেসে ওঠে হৃদয়পটে/মিহরাব তখন এগিয়ে এসে আমার সাথে কথা বলে।"

এ অবস্থা দেখে নবিজি হাতের ইশারায় নামাজ চালিয়ে যেতে বলেন। এরপর তিনি পর্দা ফেলে ঘরের ভেতরে চলে যান। এ ঘঠনার পর তিনি আর কখনও বাহিরে বের হন নি। সে দিন জুহরের নামাজের পর নবিজি সা. দুনিয়ার এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে রফিকে আলার সঙ্গে মিলিত হন। সহিহ বুখারির বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। (ফাতাহুল বারি)

ইন্তেকালের দুই দিন পর বুধবার রাতে আলী রা. আব্বাস রা. সহ আরও কয়েকজন নবিজিকে গোসল দিয়ে কাফন পরান। এরপর জানাজার নামাজ পড়া হয়। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী নবিজির কবর আয়েশা রা. ঘরের সে স্থানটিতে খনন করা হয়, যেখানে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। আবু তালহা রা. নবিজির কবর খনন করেন এবং আলি ও আব্বাস প্রমুখ নবিজির লাশ মুবারক কবরে রাখেন। কবরটি এক বিগত পরিমান উঁচু রাখা হয়।

উত্তম চরিত্র

হাফিজ মাওলানা মুসতাক আহমাদ ফারুক্বী (ইউ.কে)

নায়েবে মুহতামিম, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা

عن عبدالله بن عمرو قال قا لرسول الله ﷺ ان من احبكم الىّ احسنكم اخلاقا

অনুবাদঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন তোমাদের মধ্য হতে সৎ চরিত্রবান ব্যক্তিই আমার কাছে অধিক প্রিয়। (বুখারী-মেশকাত শরীফ ২য় পৃঃ ৪৩১)

আখলাক এর পরিচিতিঃ

আখলাক শব্দটি খুলুকুন এর বহু বচন, এর অর্থ স্বভাব-সমষ্টি বা চরিত্র। আখলাক বলতে সচ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্র দুইটি বুঝায়। সচ্চরিত্রকে আখলাকে হামিদাহ ও দুশ্চরিত্রকে আখলাকে যামীমাহ বলে। মানুষের স্বভাব যখন সামগ্রিক ভাবে সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত হয়, তখন তাকে আখলাকে হামীদাহ বা সচ্চরিত্র বলে, যে স্বভাব বা আচরণ সব সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর কাছে প্রিয়, তাকে আখলাখে হামিদা বা প্রশংসনীয় বলে। যেমন, তাকওয়া এবং এর থেকে উৎসরিত সততা, আমানতদারী, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, ন্যায় বিচার, অসহায় ও দুঃস্থদের সেবা ইত্যাদি।

ইসলামের পরিভাষায় মানুষের পারস্পারিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত আচার-আচরণ ও কর্ম-কান্ড ইসলামী শরীয়ত অনুসারে সুষ্ঠ সুন্দর কল্পনা করতঃ যথাযথ ভাবে পালন করাকে আখলাকে হামিদাহ বা সচ্চরিত্র বলে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আখলাকের কতিপয় গুরুত্বপূর্নদিক কুরআন ও হাদিসের আলোকে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

আখলাক হামিদা মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ট সম্পদ। এ ছাড়া অন্য সব সম্পদ অর্থহীন।মানুষের এ আখলাকের পূর্ণতা বিধানের জন্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এসেছিলেন তিনি বলেনঃ- انمابعثت لاتمم مكارم الخلاق

অর্থাৎ আমি মহান নৈতিক গুনাবলী পরিপূর্ণ করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। বুখরী শরিফ

ঈমামের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেনঃ- اكمل المؤمنين ايمانااحسنهم خلقا

অর্থাৎ সচ্চরিত্রতার বিচারে যে লোকটি উত্তম, মুমিনের মধ্যে সেই পূর্ণ ঈমানের অধিকারী। (তিরমিযী শরিফ)

মানব জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে আখলাক বা সচ্চরিত্র। কে কৃষ্ণাঙ্গ আর কে শেতাঙ্গ আল্লাহ সে দিকে দেখেন না। আল্লাহ দেখেন অন্তরের দিকে।

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

ان الله لاينظرالى صوركم ولكن ينظرالى قلوبكم واعمالكم

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের আকৃতির দিকে তাকান না, বরং তোমাদের অন্তর এবং আমলের দিকে তাকান। তাই আল্লাহর কাছে প্রিয়জন সেই যার স্বভাব চরিত্র শ্রেষ্ঠ। সৎকর্ম ও সুন্দর স্বভাব চরিত্রই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন البرحسن الخلق "উত্তম স্বভাবই কল্যান" মানুষের স্বভাব চরিত্র যত সুন্দর হবে সে ততই সৎকর্মশীল হবে এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় ভাজন হবে।

হাদীসে এসেছে خياركم احسنكم اخلاقا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যার চরিত্র সুন্দর।

মানুষের পার্থিব জীবনের সুখ-শান্তি যেমন উত্তম আখলাকের উপর নির্ভরশীল। তেমনি তার পরকালের সুখ-শান্তি ও মুক্তি আখলাকের উপরই নির্ভর করে। রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা কার হয়েছিল যে, কোন কাজের জন্য অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেনঃ-

تقوى الله وحسن الخلق অর্থাৎ আল্লাহর ভয়, আর উত্তম চরিত্র। তিনি আরও বলেন, নিশ্চই কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ভারী হবে, তা হল উত্তম চরিত্র। খাঁটি মুমিন হতে হলে স্বভাব চরিত্র সুন্দর হতে হয়। এ সম্পর্কে মহানবী সা. বলেন, সত্যিকার মুমিন তারাই যাদের চরিত্র সুন্দর।

উপসংহারঃ মানব জীবনে নির্ধারিত ধর্মের মূল সোপান হচ্ছে নৈতিক চরিত্র। চরিত্রের দিক দিয়ে যে যত অগ্রসর ধর্মের দিক দিয়েও সে তত অগ্রসর। সমাজ জীবনে আখলাক হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। সুতরাং আমাদের ইহ পরকালীন মুক্তি অর্জন করতে হলে অবশ্যই উত্তম চরিত্র অবলম্বন করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সৎচরিত্রবান হওয়ার তাওফীক দান করুন আমিন।"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। যে ব্যক্তি অহংকার করে স্বীয় পরিধেয় লুঙ্গি ও অন্যান্য বস্ত্র হেঁচড়িয়ে চলা-ফেরা করে।"

"অল্প দান করতে লজ্জাবোধ কর না, কেননা বিমুখ করা অপেক্ষা অল্প দান ভাল।" হযরত আলী রা.

আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী

হযরত মাওলানা মুফতি লুৎফুর রহমান খান
মুহতামিম, জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া ইমামবাড়ী মাদ্রাসা

যিনি শিক্ষা দান করেন, তিনিই শিক্ষক। কিন্তু সবাই আদর্শ শিক্ষক হন না। একজন আদর্শ শিক্ষকের মাঝে কি কি মৌলিক গুণাবলী থাকা দরকার সেটাই আলোচ্য নিবন্ধে উপস্থাপন করা হ'ল।-

আদর্শ শিক্ষকের পরিচয়:আদর্শ শব্দের অর্থ অনুকরণযোগ্য, শ্রেষ্ঠ, নমুনা, দৃষ্টান্ত, আয়না, দর্পণ ইত্যাদি। আদর্শ শিক্ষক তিনি, যার অনুকরণের মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও উন্নত করা যায় এবং জীবনের মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত ধরনের শিক্ষা লাভ করা যায়।

আদর্শ শিক্ষকের চরিত্র:বলা হয়, চরিত্র মানব জীবনের রাজমুকুট। চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর সমান। দুর্জন বিদ্বান হ'লেও পরিত্যাজ্য। তাই আদর্শ শিক্ষক সচ্চরিত্রের গুণাবলী অর্জন ও চর্চায় কোন আপোষ করেন না। ঈমান, আমলে ছালেহ সম্পাদন, তাক্বওয়া, সত্যবাদিতা, সততা, আমানতদারী, ওয়াদা পালন, শালীনতা, শিষ্টাচারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মীয়তা, মেহমানদারী, মানবসেবা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, কর্তব্য-পরায়ণতা, মিতব্যয়িতা, পরোপকারিতা, আত্মার পবিত্রতা, পরিচ্ছন্ন বেশভূষা ইত্যাদি সৎগুণ তার চরিত্রের ভূষণ। হালাল ভক্ষণ, ছোটদের স্নেহ, বড়দের কদর ও আলেমদের সম্মান ও হক প্রদানে তিনি আগুয়ান।

আদর্শ শিক্ষকের ব্যবহার:অন্য মানুষের সঙ্গে যে আচার-আচরণ করা হয় তাই ব্যবহার। সদ্ব্যবহার সচ্চরিত্রের অংশ। হাদীছে এসেছে, اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ অর্থাৎ 'সুন্দর ব্যবহারই সচ্চরিত্র'।একজন ভাল শিক্ষক নিজের শিক্ষার্থীসহ অন্য কাউকে কষ্ট দেন না। শিক্ষার্থীদের পড়া বুঝিয়ে দিতে রাগ-ক্ষোভ প্রকাশ করেন না। শিক্ষার্থীদের কেউ অসুস্থ হ'লে তিনি তাকে দেখতে যান। তাদের কারও আর্থিক সমস্যা থাকলে তা দূর করতে চেষ্টা করেন। কেউ তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করলে তিনি তার সঙ্গে কোমল আচরণ করেন এবং ধৈর্য ধরেন।স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান-াদি, প্রতিবেশী, ও চেনা-অচেনা সকলের সাথে তিনি ভাল ব্যবহার করেন। কথা বললে বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলেন। বাজে তামাশা কিংবা কারও মনে আঘাত লাগে এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকেন। আলাহর বান্দা হিসাবে সকলে ভাই ভাই হিসাবে মিলেমিশে বসবাস করেন।

আদর্শ শিক্ষকের ভাষা:আদর্শ শিক্ষক প্রমিত বা আদর্শ উচ্চারণে কথা বলেন। ঘরোয়া পরিবেশে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললেও জনসমক্ষে তিনি শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন। বিশেষত পাঠদান কালে তিনি শুদ্ধ ভাষার বাইরে যান না। মার্জিত ও শুদ্ধ উচ্চারণ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কথা বললে যথাসম্ভব শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন।

শিক্ষার্থীর চরিত্র ও মানুষ গঠনে শিক্ষক:শিক্ষার্থীরা মাতা-পিতা ও পরিবারের আদর্শ যতখানি না অনুসরণ করে তার থেকেও বেশী অনুসরণ করে শিক্ষককে। অবচেতন মনেই তাদের মাঝে এ মানসিকতা গড়ে ওঠে। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষক কোন কিছু না বললেও শিক্ষার্থীদের মাঝে তার চারিত্রিক ও ব্যবহারিক প্রভাব সঞ্চারিত হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক গুণাবলী ও আচার-আচরণ লক্ষ্য রাখলে এবং প্রয়োজনীয় হেদায়াত দিলে শিক্ষার্থীদের চরিত্র ও মনমানসিকতা আরও সুন্দরভাবে গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। তিনি তাদের দ্বীনী আক্বী-দা সংশোধন, ইবাদত-বন্দেগীতে আগ্রহ ও মানুষের সাথে মেলামেশায় পারদর্শী করে তোলেন। যারাই আত্মজীবনী লিখেছেন তারাই কমবেশী এমন প্রভাষক শিক্ষকের কথা তুলে ধরেছেন। বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক ডাঃ জাকির নায়েক তার শিক্ষক উস্তাদ আহমাদ দিদাতের নাম তার অনেক লেকচারে বলে থাকেন। একজন আহমাদ দিদাত না থাকলে হয়তো একজন ডাঃ জাকির নায়েকের দেখা মিলত না। তাই ইসলামী তরীকায় রাসূলের আদর্শে জীবনধারা গড়তে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা এখানে বিশেষভাবে কাম্য। শ্রেণীকক্ষে আদর্শ পাঠদান:য-ারা শিক্ষাগ্রহণ করে তারা শিক্ষার্থী বা ছাত্র। শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা চলমান। যে কোন নতুন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতে খাপ খাওয়ানোর কাজে শিক্ষা সাহায্য করে। আর মানুষকে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন পরিস্থিতির মুকাবেলা করতে হয়। কাজেই শিক্ষা তার প্রতিদিনই দরকার। একজন শ্রেণীশিক্ষক তার ছাত্রকে সেই নতুন পরিস্থিতি মুকাবেলার যোগ্য করে গড়ে তোলেন। শিক্ষক পড়ানোর জন্য একটা ডায়েরী রাখেন।

তাতে তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণীভিত্তিক যে পড়া দেন তা লেখা থাকে। পরবর্তী ক্লাসের পাঠদানে তিনি ডায়েরীর সহায়তা নেন। বইয়ের কতদূর তিনি পড়িয়েছেন তা তার জানা থাকে। ফলে তিনি সময় মতো পাঠদান ও পাঠ্য বই শেষ করতে পারেন। ডায়েরীতে তিনি পাঠপরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের কথা লিখে রাখেন। পাঠদানে তিনি কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে তৎপর থাকেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতি হচ্ছে কি-না তা যাচাই করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

তাদের বাড়ির কাজ দেওয়া ও পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি আগামী দিন যা পড়াবেন আগের দিন নিজে তার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেন, নোট নেন, প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগাড় করেন এবং শিক্ষার্থীদেরও আগের দিন তা বাড়ি থেকে ভালোভাবে পড়ে আসতে বলেন। এর ফলে শিক্ষার্থী কোন জায়গায় পড়া বুঝতে পারছে না তা চিহ্নিত করতে পারে এবং শিক্ষকের পড়ানোর সময় মনোযোগ দিয়ে তা বুঝে নিতে পারে।

শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষক:মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। শিক্ষকও মানুষ। কাজেই তাকে সমাজের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়। একজন ভাল শিক্ষক প্রথমেই তার পরিবারের কথা ভাবেন। পরিবারের সদস্যদের দ্বীন শেখানো, দ্বীনের উপর চালানো, আদব-কায়দা ও ভদ্রতা শেখানো, সামাজিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বুঝানোর বিষয়ে তিনি সদাই সজাগ থাকেন। সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার অধ্যয়ন থাকে। তিনি সমাজে ভাল কাজের প্রসার এবং মন্দ কাজের নিষেধে সচেষ্ট থাকেন। সমাজের নানা প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, মৃত্যু-জানাযা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদির সাথে জড়িত থাকেন। তিনি সমাজের অসহায়, ইয়াতীম, বিধবা, অসুস্থ ও দুস্থ মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবা-যত্ন করেন।

শেষকথা:আদর্শ শিক্ষক বিষয়টি মূলতঃ আপেক্ষিক। আমরা আদর্শ শিক্ষকের যে গুণাবলী এবং দায়িত্ব-কর্তব্য বলেছি তাও চূড়ান্ত কিছু নয়। অনেক শিক্ষকের মধ্যে এর থেকেও অনেক বেশী গুণ থাকতে পারে। আবার অনেকের মধ্যে এসব গুণ কম মাত্রায়ও থাকতে পারে। মোটকথা সাধ্যমত দ্বীনদারী ও সততার সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষককে একজন আদর্শ শিক্ষক বলা যেতে পারে। আলাহ বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 'আলাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না' (বাক্বারাহ ২/২৮৬)। ওয়া ছল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সালাম।

নূরানী পদ্ধতির আবিস্কারক, শাইখুল কুরআন হযরত মাওলানা **ক্বারী বেলায়েত হুসাইন রাহ.** প্রতিষ্ঠিত

নূরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ড বাংলাদেশ

সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়-এর উদ্যোগে

নূরানী মুআল্লিম প্রশিক্ষণ কোর্স

১ম ব্যাচ	১ জানুয়ারী থেকে ৫০ দিন	আরবী
২য় ব্যাচ	২৪ ফেব্রুয়ারী (২৫ শাবান) থেকে ৫০ দিন	আরবী
৩য় ব্যাচ	১ মার্চ থেকে ১মাস (রমজানের ব্যাচ)	বাংলা-ইংরেজী
৪র্থ ব্যাচ	২০ এপ্রিল থেকে ঈদুল আযহা পর্যন্ত	আরবী
৫ম ব্যাচ	১ মে থেকে ১মাস	বাংলা-ইংরেজী
৬ষ্ট ব্যাচ	২০ জুন থেকে ৫০ দিন	আরবী
৭ম ব্যাচ	২০ আগষ্ট থেকে ১মাস	বাংলা-ইংরেজী
৮ম ব্যাচ	১ অক্টোবর থেকে ৫০ দিন	আরবী
৯ম ব্যাচ	১০ নভেম্বর থেকে ৫০ দিন	আরবী
১০ম ব্যাচ	১ ডিসেম্বর থেকে ১মাস	বাংলা-ইংরেজী

প্রশিক্ষণ শেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে খেদমতের ব্যবস্থা দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশিক্ষণ শুরুর ১দিন পূর্বে প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন ও ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি নিয়ে আসতে হবে।

আরবী কোর্স: **৮,৫০০ টাকা**
বাংলা-ইংরেজী: **৫,৫০০ টাকা**

বি. দ্র.
সিলেট বিভাগে আমাদের আর কোন শাখা কেন্দ্র নেই।

স্থান **নূরানী মুআল্লিম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র**
চান্দাই (তালুকদারপাড়া), ৩০ নং ওয়ার্ড, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
০১৭১৯-২৩৪০৫৯, ০১৭১১-৯৫৫০১৫

কুরআন শিক্ষার ফজীলত ও গুরুত্ব

হযরত মাওলানা নূরুল হক নবীগঞ্জী

সূচনা: কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম। সর্ব প্রথম নাজিল করা হয় লওহে মাহফুজে। সেখান থেকে নাজিল করা হয় সামা আদদুনিয়া বা প্রথম আসমানে। সেখান থেকে দীর্ঘ ২৩ বছরে মহানবী মুহাম্মদ সা. এর উপর কুরআন নাজিল করা হয়। কুরআন গোটা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য নাজিল করা হয়েছে। কুরআন থেকে দূরে থেকে কোন জাতি হেদায়েত প্রত্যাশা করতে পারে না। তাইতো নবীজি হাদীসে বিদায় হজ্বের ভাষনে বলে গেছেন তোমাদের কাছে দুটি বস্তু রেখে গেলাম ,যথা কুরআন ও (তার ব্যাখ্যা) এবং রাসূলের সুন্নাহ। অতএব আমাদের উচিত কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব: ৩০ পারা কুরআন ২৩ বছরে নাজিল হলেও সর্ব প্রথম সূরা আলাক এর প্রথম পাঁচ আয়াত নাজিল হয়। প্রথম আয়াতে প্রথম শব্দটি ইক্বরা বা পড়া। অর্থাৎ ইক্বরা হল কুরআন বা কুরআন পড়া। পবিত্র কুরআনে নামাজ-রোজা সহ অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ আদেশ-নিষেধ সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। সর্বাগ্রে কুরআন পড়ার নির্দেশ দিয়ে মূলত কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

কুরআন শিক্ষার ফজীলত: নবীজি ইরশাদ করেন তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ট তারা যারা কুরআন শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা প্রধান করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তোমাদের মধ্যে উত্তম তারা যারা কুরআন শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা প্রধান করেন। উভয় বর্ণনা থেকে প্রমান হয় সমাজে সকল শ্রেনী পেশার মানুষের মধ্যে কুরআন শিক্ষার্থী এবং কুরআন শিক্ষাদান কারী শ্রেষ্ট।

পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ মহাগন্থ নেই যার একটি হরফ পাঠ করলে ১০ টি নেকী বা ছাওয়াব হয়। কিন্তু পবিত্র কুরআনে একটি হরফ পাঠ করলে ১০ টি নেকী বা ছাওয়াব পাওয়া যায়। যেমন হাদীস শরিফে নবীজি ইরশাদ করেন, যে আল্লাহর কিতাব কুরআন থেকে একটি হরফ পাঠ করল তার একটি ছাওয়াব হল। আর একটি ছাওয়াবের পরিমান ১০ গুণ। আমি বলছি না আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। নবীজি সা. উক্ত বাণী থেকে প্রতিয়মান হয় কুরআন তেলাওয়াতের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। যার ফলে কুরআনের একটি হরফের বিনিময়ে মহান আল্লাহ ১০ নেকী দিয়ে থাকেন।

কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য আল্লাহর নিকট শাফায়াত করবে। যেমন নবীজি হাদিস শরিফে ইরশাদ করেন "তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, কেননা কিয়ামতের দিন তেলাওয়াত কারীর জন্য তা আল্লাহর নিকট শাফায়াত কারী হিসেবে উপস্থিত হবে"।

কুরআন তেলাওয়াত কারীর জন্য জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। যেমন হাদীস শরিফে ইরশাদ করেন, কুরআন তেলাওয়াত কারীকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত কর এবং উপরে উঠতে থাকো। দুনিয়াতে তুমি যেভাবে ধীরে সুস্থে তেলাওয়াত করতে সেভাবে তেলাওয়াত কর। কেননা তেলাওয়তের শেষ আয়াত সংখ্যার জান্নাত হবে তোমার বাসস্থান।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন শিক্ষা করা ও তেলাওয়াত করা আমাদের জন্য অপরিহার্য অতএব প্রতিদিন অল্প হলেও কুরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলি, কুরআন বুঝার চেষ্টা করি এবং কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন আমিন।

সীরাতচর্চা: সাহাবায়ে কেরাম ও আমরা

হাফিজ মাওলানা মাহমুদুর রহমান সালিম
মুহাদ্দিস ও মুহতামিম জামেয়া হুসাইনিয়া মিরপুর, বাহুবল

আলাহ তাআলা যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। বিশ্ববাসীকে সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও সফলতার পথ প্রদর্শনের জন্য সর্বশেষ নবী প্রেরণ করেছেন মুহাম্মাদ ﷺ কে এবং বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাঁর আনুগত্য করে। তাঁর আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করে। তাঁর শিক্ষা-নির্দেশনা মেনে চলে। সর্বোপরি তাঁকে আদশরূপে গ্রহণ করে।সাহাবায়ে কেরাম আলাহর নির্দেশমতো নবী ﷺএরআনুগত্য করেছেন। এক্ষেত্রে গোটা উম্মতের ইতিহাসে তাঁদের রয়েছে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। নবীজীর আনুগত্যের যে দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছেন এর নজির কেবল তাঁরাই। তাঁরা তাঁর আদেশ-নিষেধ, শিক্ষা-নির্দেশ-না, বাণী, কর্ম সবকিছুর অনুসরণ করতেন। তাঁর চোখের ইশারা ও মনের ভাষা পর্যন্ত অনুধাবন করতেন। তাঁর আদেশ-নিষেধ মানার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর আদেশকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁর পছন্দ নয় এমন কাজ পরিহার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করতেন না। আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, চলাফেরা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে তাঁকে আদশরূপে ধারণ করেছিলেন। তাঁদের জীবন ছিল নববী-আদশের জীবন্ত ছবি। নবীজীর পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ আনুগত্যই গোটা উম্মতের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মে পরিণত করে।নবী ﷺএরপ্রতি সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্যের সব দিক, সব বৈশিষ্ট্য, সব দৃষ্টান্ত আলোচনা করা দুরূহ। এ তো অকূল সমুদ্র। এখানে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কয়েকটিমাত্র ঘটনা উদ্ধৃত করব।নীতি-নৈতিকতা ও আদশের উপর অবিচলতা উসওয়ায়ে হাসানার সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজ আমাদের মাঝে নীতিনৈ-তকতা ও আদর্শ বিষয়ে অনেক দুর্বলতা চোখে পড়ে; কখনো অজ্ঞতার কারণে, কখনো শৈথিল্যের কারণে, যাকে আমরা নাম দিয়েছি উদারতা, আবার কখনো সাহস ও হিম্মত কম হওয়ার কারণে। এটা নবী-আদশের সম্পূর্ণ বিপরীত।এ সম্পর্কে চিন্তাশীলদের জন্য পবিত্র সীরাতের কয়েকটি ঘটনা উলেখ করছি।

এক.যখন কুরাইশ আবু তালেবকে বাধ্য করতে চাচ্ছিল তিনি যেন আপন ভাতিজার সাহায্য ত্যাগ করেন, আর শেষে আবু তালিবও রাসূলে কারীম ﷺএর সামনে নিজের অপারগতার কথা উলেখ করেছিলেন, সে সময় রাসুলুলাহ ﷺ একটি ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, যা সবারই জানা আছে।

তিনি বলেছিলেন-

ياعم! والله،لووضعواالشمس في يميني والقمرفي يساري على أن أترك هذاالأمرحتى يظهره الله أوأهلك دونه ماتركته

'চাচাজান! এরা যদি তাওহীদের দাওয়াত ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয় তবুও আমি তা ছাড়ব না। এরপর হয় আলাহ এই দ্বীনকে বিজয়ী করবেন অথবা আমি শহীদ হব।মক্কার মুশরিকদেরকে তিনি এই কথাও বলেছিলেন যে-

أترون هذه الشمس؟قالوا : نعم،قال : فماأن اباأقدرعلى أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوامنهاشعلة

অর্থাৎ এই যে সূর্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে এক খন্ড অগ্নি নিয়ে আসা যেমন তোমাদের পক্ষে অসম্ভব তেমনি আমার পক্ষে এই দাওয়াত ত্যাগ করাও অসম্ভব।-সীরাতে ইবনে ইসহাক

দুই.সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. ইসলাম গ্রহণের আগে থেকেই মায়ের প্রতি যত্নবান ও সদাচারী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মা বলল, তুমি এ কী দ্বীন গ্রহণ করেছ? তুমি তা ত্যাগ করো, নতুবা আমি পানাহার ছেড়ে দেব। আমি না খেয়ে মারা গেলে মানুষ তোমাকে মাতৃহন্তা বলবে। সা'দ রা. বললেন-

لا تَفْعَلِي يَا أُمَّ، إِنِّي لَا أَدَعُ دِينِي هَذَا لِشَيْءٍ

আম্মা! আপনি এমন করবেন না। আমি আমার দ্বীন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না।

এ কথা শুনেও তাঁর মা দুই দিন না খেয়ে কাটাল। এতে মহিলা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ল। মহিলা ভেবেছে, এই অবস্থা দেখলে তার মা-ভক্ত ছেলের অন্তরে 'দয়া'র সৃষ্টি হবে এবং মাকে বাঁচানোর জন্য সে ইসলাম বর্জন করবে! কিন্তু সা'দ রা. এবার আরো পরিষ্কার ভাষায় বললেন-

يَا أُمَّهْ، تَعْلَمِينَ وَاللّٰه يا أُمَّهْ، لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْس فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا، مَا تَرَكْتُ هَذَا لِشَيْءٍ، إِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي

আম্মাজী! আপনি জেনে রাখুন, আলাহর কসম, আপনার যদি একশ প্রাণ থাকত আর সবগুলো একের পর এক বের হয়ে যেত, তবু আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। আপনার ইচ্ছে হলে খেতে পারেন আর ইচ্ছে না হলে নাও খেতে পারেন।-তারীখে দিমাশক, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,এ ঘটনা থেকে আন্দায করা যায় দ্বীনের উপর অবিচলতা হযরত সা'দ রা.-এর কত দৃঢ় ছিল! যার কাছে জন্মদাতা মাও হার মানায়কারণ, ঈমানবিহীন জীবন জীবনই নয়।তিন.খাব্বাব ইবনে আরাত রা. জাহেলী যুগে কর্মকার ছিলেন। আস ইবনে ওয়াইলের কাছে তাঁর কিছু দিরহাম পাওনা ছিল। পাওনা চাইতে গেলে আস বলল, আলাহর কসম,

মুহাম্মাদের সঙ্গে কুফরী না করলে আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাব্বাব রা. বললেন-

لَا،وَاللّٰهِ لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى يُمِي تَكَ اللّٰه ثُمَّ يَبْعَثَكَ.

আলাহর কসম, তুমি যদি মারা যাও তারপর পুনরায় জীবিত হও, তবু আমি মুহাম্মাদ ﷺএর সঙ্গে কুফরী করব না। -সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম আস ইবনে ওয়াইল মনে করেছিল, খাব্বাব রা. পাওনার জন্য কুফরী করে ফেলবেন, দ্বীন ও আদর্শ বিসর্জন দিয়ে দিবেন। কিন্তু খাব্বাব রা. তাকে জানিয়ে দিলেন, দ্বীন ও আদশের্র বিপরীতে অর্থ-বিত্ত কিছুই না। অথের্র জন্য কুফরী করা, দ্বীন ও আদর্শ বিসর্জন দেয়া সম্ভব না; কস্মিনকালেও না।

আত্মীয়তা রক্ষা করা, নিঃসদের দায়িত্বভার গ্রহণ করা, মেহমানের আপ্যায়ন করা ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। গারে হেরায় রাসূল ﷺএরকাছে সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যখন বলেছিলেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো তখন হযরত খাদীজা রা. নবীজিকে বলেছিলেন-

كَلاَّوَاللَّهِ،مَايُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا;إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ،وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِيالضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

আলাহর কসম, কখনই নয়। আলাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্থ ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। সহী বুখারী, হাদীস-০৩এসব বৈশিষ্ট্য নবীজীর মাঝে যেমন ছিল, তেমনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও ছিল।হযরত আবু বকর রা. যখন মক্কার কাফেরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হাবাশায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন তখন ইবনুদ দাগিনা আবু বকরকে রাস্তায় পেয়ে বললেন,

إِنَّ مِثْلَكَ لاَيَخْرُجُ وَلاَيُخْرَجُ;فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ،وَتَصِلُ الرَّحِمَ،وَتَحْمِلُ الْكَلَّ،وَتَقْرِي الضَّيْفَ،وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

আপনার মতো একজন মানুষ মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়া অথবা মক্কা থেকে বের করে দেয়া কোনটাই সমীচীন নয়। কারণ, আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্থ ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। সহী বুখারী, হাদীস-২২৯৭

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে নবী ﷺএর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য কী পরিমাণ ছিল তার কিছুটা অনুধাবন করা যায়। আমাদেরকেও এভাবেই সীরাত চর্চা করতে হবে।

আলাহ তাআলা আমাদেরকে সর্বদা সর্বক্ষেত্রে প্রিয়নবীর আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

অসত্যের দাপট ক্ষণস্থায়ী
কিন্তু সত্যের গৌরব চিরস্থায়ী।
হযরত সোলাইমান আ.

তাওবার গুরুত্ব ও ফযীলত

মাওলানা রফিকুল ইসলাম বিথঙ্গলী
প্রধান পরিচালক জামিয়া ইসলামীয়া ফুরক্বানীয়া মাদ্রাসা

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাদের এক বিশেষ গুণ। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু শয়তানে প্ররোচনায় পড়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ লঙ্গন করে বসে, আল্লাহ তায়ালার মরজি মোতাবেক চলার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে, তাই আল্লাহ তায়ালা তার সে ভুল বা গুনাহ থেকে মুক্তিদানের তাওবা ও ইস্তেগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন। তাই তাওবা ও ইস্তেগফার একজন মুমিনকে দান করে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ জীবণ। মুমিনকে সর্বদা গুনাহমুক্ত জীবনের প্রতি করে অনুপ্রাণিত। মুমিনকে নিয়ে যায় ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে উন্নতি ও মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে। তাই তাওবা ও ইস্তেগফার মুমিনের জীবনে এক অপরিহার্য বিষয়। তাকওয়াপূর্ন ও গুনাহমুক্ত জীবন লাভ করতে যা একান্ত জরুরি। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে মুত্তাকীদের গুণাবলীর বর্ণনা দিয়ে বলেন।

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

এবং তারা সেই সফল লোক, যারা কখন কোন অশ্লীল করে ফেললে বা (অন্য কোনভাবে) নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আল্লাহ ছাড়া কেই বা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পরে। আর তারা জেনে শুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না। সূরা আলে ইমরান ০৩-:১৩৫ তাওবা ও ইস্তেগফার নবীদের সুন্নত: নবী-রাসূলগণ নিজেরা যেমন আপন রবের কাছে তাওবা ইস্তেগফার করেছেন, উম্মতকেও তাওবা ইস্তেগফার করতে আদেশ করেছেন। নবীগণের তাওবা ও ইস্তেগফার: নবীগণও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাওবা ও ইস্তেগফার করেছেন। তাদের তাওবা ও ইস্তেগফার ঘঠনা ও ভাষা কুরআন মাজীদে বিবৃত হয়েছে। আমরা এখানে কুরআন থেকে কয়েকজন নবীর তাওবা ও ইস্তেগফারের বর্ননা তুলে ধরেছি। হযরত আদম আ: এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তেগফার:

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

হে আমার রব আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তভুক্ত হয়ে যাব। সূরা আরাফ (০৭) : ২১ হযরত নূহ আ. এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তেগফার

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ . وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا

হে আমার রব আপনি আমার পিতা-মাতাকে এবং আমার ঘরে যারা ঈমানের সঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং মুমিন নর-নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি যালেমদেরকে ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। সূরা নূহ (৭১) ;২২

হযরত মূসা আ. এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তেগফার:

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيْمُ

হে আমার রব নিশ্চই আমি আমার প্রতি যুলুম করেছি। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তাই তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। সূরা কাসাস (২৮) : ২৪

হযরত মুহাম্মদ সা. এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তেগফার

عن الاغر بن يسار مزني رض قال: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ، فَانِّي أَتُوْبُ فِيْ الْيَوْم إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

হযরত আগার ইবনে ইয়াসার আলমুযানী রা. বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, হে লোকসকল তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর কেননা আমি দিনে একশত বার তাওবা করি। সহীহ মুসলিম হাদীস ২৭০২, এখানে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের গোটা জীবন আল্লাহ তায়ালার তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তাই তারা যাবতীয় গুনাহ থেকে দূরে থেকে জীবন যাপন করেন। তাদের থেকে কখনও সগীরা বা কবীরা গুনাহসংঘটিত হয় নি । এজন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্ববাদী আকীদা হল নবী ও রাসূলগণ মাসূম ও নিষ্পাপ। নবীগণ তাদের উম্মতকে তাওবা ও ইস্তেগফার শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত সালেহ আ. কতৃক তার উম্মতকে তাওবা ও ইস্তেগফার শিক্ষাদান:

وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

আমি ছামুদ জাতির কাছে সালেহকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। তাই তোমরা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তার দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চই আমার রব অতি নিকটে এবং দোয়া কবুলকারী। সূরা হুদ (১১): ৬১

এভাবে সকল নবী উম্মতকে আল্লাহর দরবারে নিজেদের ভূলক্রটি ও গুনাহের জন্য তাওবা ও ইস্তেগফার করার আদেশ করেছেন।

তাওবা ও ইস্তেগফার মুমিনকে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা দয়া লাভে সাহায্য করে

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَ اسْتَغْفِرُو اللّٰه اِنَّ اللّٰه غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল অতি দয়ালু। সূরা বাকারা (২) ১৯৯

তিনি আরও বলেন

وَ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْ بُوْا اِلَيْهِ. اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ

তোমার তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তার কাছে ফিরে আস। নিশ্চই আমার রব অতি দয়ালু ও অধিক মমতাময়। সূরা হুদ (১১) ৯০

তাওবা ও ইস্তেগফারকারীদের প্রতি আল্লাহ শাস্তি প্রেরণ করেন না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُم وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় কিছুতেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায়ও তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। সূরা আনফাল (০৮) :৩৩ এমনকি তাওবা ইস্তেগফারের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জাতির উপর শাস্তি আসার প্রতিশ্রুতিদেওয়ার পরও সে শাস্তিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে হযরত ইউনুছ আ. এর কওমের ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যা আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

فَلَولا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّاقَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّآ اٰمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الخِزْيِ فِىْ الحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُم اِلى حِيْن

কোন কোন জনপদ বাসীরা ঈমান আনয়নকারী হল না? তাহলে তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত। তবে ইউনুছের সম্প্রদায় ব্যতিক্রম। তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি পার্থিব জীবনে তাদের উপর থেকে লাঞ্ছনার আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেকে একটা সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম। সূরা ইউনুছ (১০): ৯৮

হযরত ইউনুছ আ. তার কওমকে তাওহিদের দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে বহুভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা তার দাওয়াতে সাড়া দিল না। বরং তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্গনে ডুবে থাকল। তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আসার প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে দিলেন। হযরত ইউনুছ আ. যেহেতু বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের উপর তো এখন শাস্তি অবধারিত, তাই তিনি নিজ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। তারা হযরত ইউনুছ আ. কে যখন খুজে পেল না তখন তারা বুঝতে পারল যে, এখন তো আমাদের উপর শাস্তি এসেই যাবে। তাই তারা তাওবা ইস্তেগফার করতে লাগল। তাদের এ অবস্তা দেখে আল্লাহ তায়ালা আর শাস্তি প্রেরণ করলেন না। এভাবে তারা তাওবা ও ইস্তেগফারের ফলে আল্লাহর শাস্তি থেকে বেচে গেল। তাওবা ও ইস্তেগফার মুমিনের পার্থিব নিয়ামত, শক্তি সামর্থ ও যাবতীয় সমৃদ্বি লাভে সাহায্য করে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে;

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَل لَكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَل لَّكُمْ اَنْهٰرًا

আমি বললাম তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষামা প্রার্থনা কর। নিশ্চই তিনি ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য বিভিন্ন উদ্যান ও নদ নদী সৃষ্টি করে দেবেন। সূরা নূহ (৭১) : ১০-১২

এভাবে কুরআন মাজিদে তাওবা ও ইস্তেগফারের অনেক ফায়দা উপকারের কথা তুলে ধরেছে। তাই আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা, দয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সব দিক থেকে তার সাহায্য লাভ করার জন্য তাওবা ও ইস্তেগফারের বিকল্প নেই।

তাওবা ও ইস্তেগফারের উপকারিতায় রাসূলে কারীম সা. বক্তব্য, তিনি বলেন

عَن ابن عبّاس رض قال. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ مَنْ لَّزِمَ الاستغفار جعل اللّٰه له من كل ضيق مخرجا ، و من كل هم فرجا ، و رزقه من حيث لا يحتسب.

যে ব্যক্তি বেশী বেশী ইস্তেগফার করবে আল্লাহ তায়ালা। তার সকল সংকট থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেন, তার সকল পেরেশানী দূর করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। সুনানে আবু দাউদ হাদীস। ১৫১৮

মোট কথা, তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে একজন মুমিনের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সফল হয়। এর মাধ্যমে একজন মুমিন লাভ করে উভয় জাহানের সমৃদ্ধি। সর্বোপরি তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহ তায়ালার নিকটতম বান্দায় পরিণত হয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সগীরা কবিরা গুনাহসহ সব ধরনের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করেন। এবং আমাদেরকে সব ধরনের গুনাহ থেকে তাওবা করার তাওফীক দান করেন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

অন্তরে চিন্তা-ভাবনার প্রকারভেদ এবং মন্দ চিন্তা থেকে বেঁচে থাকার উপায়

মাওলানা মুজাম্মিল হক

(নাজিমে তালিমাত জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা)

অন্তরে চিন্তা-ভাবনা উদয় হওয়া সৃষ্টিগত একটি বিষয়। মানুষ মাত্রই তার অন্তরে সব সময় কোন না কোন চিন্তা ঘুরপাক খাবে। তবে মুমিন বান্দার জন্য এ ক্ষেত্রে করণীয় হল, অন্তরের চিন্তা-ভাবনাকে নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখা। অন্তরের চিন্তা-ভাবনাকে যিনি পুর্ণমাত্রায় নিজের আয়ত্বে রাখতে পারেন, তাঁর পক্ষে ইসলাহে নফস বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সহজ। এর দ্বারা তিনি নফসের গোলামি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।

হযরত ইমাম ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রঃ) অন্তরের চিন্তা ভাবনাকে ৩ চারটি ভাগে ভাগ করেছেন-

১.দুনিয়ার কোন জিনিস বা বিষয় পাওয়ার চিন্তা-ভাবনা।

২.দুনিয়াবি কোন ক্ষতি থেকে মুক্তি লাভ অথবা মুক্ত থাকার চিন্তা-ভাবনা ।

৩.আখিরাতের কোন কিছু লাভ করার চিন্তা-ভাবনা।

৪.আখিরাতের কোন ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা-ভাবনা।

তিনি বলেন:- এই চার প্রকারের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে মুমিন বান্দা সতর্ক থাকা উচিত।

অন্তরে কোন চিন্তা-ভাবনা উদয় হওয়ার সাথে সাথে খিয়াল করতে হবে, চিন্তাটি উপরোক্ত চার প্রকারের কোন প্রকারের। যদি আখিরাত বিষয়ক হয়, যেমন- কাউকে সৎকাজের আদেশ দিবেন বা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন।অথবা দু রাকাত নামাজ পড়বেন, কোন অসহায়কে সহায়তা করবেন, বা যেকোন ধরনের ভাল কাজ করবেন যার প্রতিদান আখিরাতে পাওয়া যাবে অথবা কোন গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকবেন, তাহলে সেই ভাবনাটি দ্রুত বাস্তবায়ন করে ফেলা উচিত। আর যদি চিন্তাটিদুনিয়াবি কোন কিছু অর্জন করা বা দুনিয়ার কোন ক্ষতি থেকে মুক্তিলাভের বিষয় হয়, তাহলে তা কতটুকু করা জরুরি, শরিয়তের দৃষ্টিতে কোন বিধি নিষেধ আছে কি না এসব বিষয় খিয়াল করা আবশ্যক। যদি শরিয়তের খেলাপ হয়,তাহলে এই চিন্তা অন্তর থেকে সরিয়ে ফেলা জরুরি।এখানে প্রথম দুই প্রকার চিন্তা-ভাবনা আমাদের জন্য অধিক খতরনাক। এখানে শয়তানের ওয়সওয়াসা ও ধোকা কাজ করে বেশি। দুনিয়া সর্ম্পকিত অধিকাংশ ভাবনাই গুনাহের উৎস হয়ে থাকে। বিতাড়িত শয়তান এসব চিন্তা ভাবনাকে বান্দার কাছে মজাদার ও আকর্ষনীয় করে তোলে। আর গুনাহের কাজ বাস্তবে করা কখন কখন কঠিন হলেও সেই গুনাহের বিষয়ে মনের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা তৈরী করা সহজ। যেমন-পরনারীনিয়ে ভাবনা। সামাজিকতার খাতিরে একজন পুরুষ পরনারীর সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতে পারে না। কিন্তু তাকে নিয়ে মনের মাঝে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। বিতাড়িত শয়তান এই সুযোগটাই গ্রহণ করে। নারীকে নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনায় বিশেষ এক ধরনের মোহ ও স্বাদ তৈরী করে দেয়। তাই মুমিনের উচিত হল, চিন্তা-ভাবনার এই মোহ ও স্বাদ সর্ম্পকে সতর্ক থাকা। গুনাহমুলক চিন্তা যখন মনের মাঝে উদিত হবে, সঙ্গে সঙ্গে মনকে সেই চিন্তা থেকে ঘুরিয়ে নেওয়া। স্বাভাবিকভাবে অন্তরে যে মন্দ ভাবনা জাগে, তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু অন্তরে উদিত সেই মন্দ ভাবনাটিকে স্থায়ীত্ব দিলে বা তা বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্প করলে উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কেননা গুনাহের প্রতিজ্ঞা করাও গুনাহ। মুসলিম শরীফের ২৮৮৮ নং হাদিসে আলাহর রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ 'দুজন মুসলমান যখন তরবারি নিয়ে পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী'। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ' এখানে নিহত ব্যক্তির কি দোষি? 'নবী কারীম (সঃ) জবাবে বলেনঃ নিহত ব্যক্তিটিও তার সঙ্গী লোকটিকে হত্যা করতে দৃঢ় ইচ্ছা করেছিল'।এ হাদিস দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, কারো অন্তরে গুনাহে ভাবনা জাগার পর গুনাহের সেই কাজটি বাস্তবায়নে সে যদি দৃঢ় সংকল্প করে, তাহলে সে গুনাহের ভাগিদার হবে।মন্দ ভাবনা গুনাহের কাজকে সহজ করে দেয়। তাই প্রত্যেকের উচিত, মন্দ ভাবনার বিষয়ে নিজের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ রাখা। এবিষয়ে সর্বদা আলাহ তা'লার কাছে সাহায্য কামনা করা। মন্দ ভাবনা থেকে বাঁচার জন্য হাদিস শরীফে বিশেষ একটি দোয়া আছে-

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَاعَلَي دَيْنِك،يَامُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّف قُلُوْبَنَااِلي طَاعَتِكَ

অর্থাৎ- হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্টিত করুন। হে অন্তর সমূহের পরিচালনাকারী, আমাদের অন্তর সমূহকে আপনার আনুগত্যের পথে পরিচালিত করুন। এই দু'আ বেশি বেশি করে পাঠ করা। পাশাপাশি অন্তরকে সব সময় সুচিন্তা ও নেক ভাবনার মধ্যে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করা।বস্তুত মানুষের মনে যত চিন্তা-ভাবনা উদয় হয়, তার মধ্যে সর্বোত্তম চিন্তা-ভাবনা হল, যা আলাহ তা'লার জন্য হয়।

আর যে চিন্তা-ভাবনা আলাহর জন্য হয়, ইমাম ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (রহঃ) এ ধরনের চিন্তা-ভাবন-াকে ৫ ভাগে ভাগ করেছেন-

১. আলাহ তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আয়াত সমূহ, অর্থাৎ- কুরআনুল কারীম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গভেষণা করা।

আলাহ তায়ালা প্রতিটি বানীকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা । পবিত্র কুরআন শুধু তেলাওয়াতের জন্য নাযিল হয়েছে এমন নয়। তিলাওয়াত হলো অনুধাবন করার মাধ্যম মাত্র। কোন এক বুজুর্গের উক্তি-

اُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِهِ،فَاتَّخَذُوْاتِلَاوَتَهُ عَمَلًا

অর্থাৎ- কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আমলের জন্য। অতএব তোমরা আমলের নিয়তে কুরআন তিলাওয়াত কর।

২. আমাদের চারিদিকে ছরিয়ে-ছিটিয়ে আছে আলাহ তায়ালাঅসংখ্য কুদরতি নিদর্শন। সেগুলোর দিকে খিয়াল করা, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা। আলাহ তা'লার কুদরত নিয়ে এভাবে চিন্তা-ফিকির করা কুরআনের নর্দেশ রয়েছে।

৪. নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা। এবং যারা আলাহ তা'লার কুদরত নিয়ে চিন্ত-ফিকির করে না ,তাদেরকে নিন্দা করা হয়েছে।

৩. আলাহ তা'লার অসংখ্য দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে আমাদের উপর। সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা ।

উলেখিত এই তিন প্রকার চিন্তা-ভাবনা মানুষকে পর্যায়ক্রমে আলাহর ওলী বানিয়ে দেয়। মানুষ আলাহর পরিচয় খুঁজে পায় এসকল চিন্তা-ভাবনায়, ফলে আলাহর ভালবাসায় তার জীবন রঙিন হয়ে ওঠে। এচিন্তা মানুষকে ক্রমান্নয়ে একজন ভালো মানুষে পরিনত করে। বহুবিধ কল্যাণের দরজা খুলে দেয়। অসৎ চিন্তা দুর্বল করে ফেলে এবং সৎ চিন্তা জাগ্রত করে।

৫. প্রতিদিনের আমল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। এচিন্তা করতে থাকলে সময় অপচয়ের সম্ভাবনা কমে যায়।

উলেখিত পাঁচ প্রকার চিন্তা-ফিকির ছাড়া অন্য যেসকল চিন্তা-ভাবনা মানুষের মনে উদয় হয়, তা বিতাড়িত শয়ত-ানের ধোঁকার ফলেই হয়ে থাকে। অন্তত যতক্ষন অলস থাকবে, ততক্ষন অহেতুক চিন্তা-ভাবনা উদয় হতে থাকবেই। স্বাভাবিকভাবে এটা দোষনীয় নয়। কিন্তু সার্বক্ষনীক এ চিন্তায় মগ্ন থাকলে ইহা দোষনীয় বলে বিবেচিত হবে।

যার অন্তরে শরীষা পরিমাণ
অহংকার থাকবে,
সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।
মুসলিম শরীফ

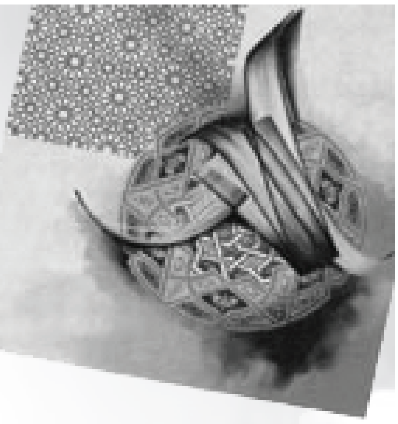

আমাদেরকে নেক এবং এক হতে হবে

মাওলানা সাহেদ আহমদ গহরপুর

নাজিমে তালিমাত, নূরানী তালিমুল কুরআন বোর্ড সিলেট

রম করুণাময় সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আমোঘ বাণী "তোমরা নিরাশ হইও না এবং দুঃখ করো না যদি তোমরা মুমিন হও তবে তুমরাই শ্রেষ্ট" এবং " মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্তব্য" দ্বয়ের আলোকে বর্তমান বিশ্বের মুমীন মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, সারা পৃথিবীতে আজ তাদের এ দৈন্য দশা কেন? মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে তারা অন্যান্য জাতির শীর্ষে ত নয়ই বরং প্রায় সর্বত্রই লাঞ্ছিত, অবহেলিত নিপীড়িত নিষ্পেষিত। মহান আল্লাহর অমোঘ বাণী দ্বারা ঘোষিত সাহায্য প্রাপ্তি থেকেও তারা বঞ্চিত। সারা বিশ্বে সমুদয় অনৈসলামিক অপশক্তি সমূহ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্বে ঐক্যবদ্ব হয়ে তাদের মূলোৎপাটনে কাতার বন্দী হয়ে গেছে, যেভাবে হয়েছিল হুজুর পাক (সা.) এ মদিনা জিবনের পঞ্চম বর্ষে আযাবের লড়াইয়ে। তারা যেখানেই ইসলামি শক্তি উদ্ভব হতে দেখে সেখানেই নানান অজুহাত খাড়া করে তাদেরকে কোণঠাসা করতে মরিয়া হয়ে লেগে যায়। দ্বীন ইসলামের সাথে যেখানে যেভাবে যাদের সম্পৃক্ততা তারা লক্ষ্য করে, সেখানেই বিস্তার করে তাদের নখর এবং শুরু করে সাঁরাশি অভিযান। সম্প্রতি তারা আফগানিস্তানের তালেবান সংগঠনকে উপলক্ষ বানিয়ে বিভিন্ন দেশের মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে বক্তব্য ছাড়তে শুরু করেছে।

আজও বিশ্বের অনেক দেশে ও জনগোষ্ঠি গোলামির অক্টোপাস থেকে মুক্ত হতে পারে নি। আধিপত্যবাদী শক্তি সমূহের অশুভ দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে মুসলিম জনগোষ্টির উপর। তারা একদিকে টান্ডা মস্তিষ্কে, সুচিন্তে পরিকল্পনার মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংশ করে দেয়ার জন্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে বহাল তরিয়তে এগিয়ে নিচ্ছে। এবং অন্যদিকে তার পাশাপাশি দৈহিকভাবে নির্মূল করার কাজও চালিয়ে যাচ্ছে অব্যাহত গতিতে। কাসোভো, ফিলিস্তিন, লেবানন, আফগানিস্তান, ভারত বার্মা, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া, ইত্যাদি সবত্র একই ঘটনা। মুসলিম রক্তের হোলিখেলায় সভ্যতাগর্বী দেশ ও জাতি সমূহ সদা ব্যস্ত। কিন্ত মুসলমান জাতি অবচেতনায় যেন আজ বিভোর। জাতিগতভাবে এ মহা দূর্যোগের মোকাবিলায় কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেই বললেও অযুক্তি হবে না। এক দেশের এবং এক অঞ্চলের মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে আফসোসই করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে না আছে সক্রিয় যোগাযোগ এবং পনা আছে সাহায্য সহযোগীতার কোন কার্যকর পদক্ষেপ। আর এর প্রধান কারণ হচ্ছে মুসলমানদের মজবুত ইমান এবং সুদৃঢ় একতার অভাব।

সোনালী যুগের মুসলমানদের ন্যায় তাই আজ প্রয়োজন তেজোদীপ্ত ঈমান ও সৌহার্দ্যপূর্ণ একতা ও ভালবাসা। ঐ যুগের মুসলমানরা তাদের ঈমানের অঙ্গিস্ফুালঙ্গ দিয়ে ছিন্ন ছিন্ন করেছিলন অসত্যের কৃষ্ণ যবনিকাকে সমুদ্রের উর্মি মালার মত ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বাতিলের তৃণলতাকে। ইসলামি আদর্শের প্রচার প্রসারে তারা ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তিমিরাচ্ছন্ন ধরার বুকে তারা ছিলেন তৌহিদের নিশান বরদার। তেজস্বী ঈমানের বলে বলীয়ান ছিলেন বলে তারা কোনরূপ ভীতি-শংকা, লোভ লালসা ও অশুভ চাপের মুখে দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি। যার জন্য তাদের মুঠোয় এসেছিল দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। আমাদেরকে আজ তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে হলে বিশ্ব মুসলিমের ঈমান ও আমলকে মজবুত করা যার বদৌলতে আমরা উপযুক্ত হবো মহান আল্লাহ তায়ালার রহমত, বরকত ও সাহায্য লাভের। ঈমান সুদৃঢ় করণের মেহনত করে আমাদেরকে হতে হবে এক এবং আমলের অনুশীলন দ্বারা হতে হবে নেক। আর তার মাধ্যমেই আমরা হতে পারবো বিশ্বের সেরা জাতি মুমিন মুসলমান।

আত্মার পরিশুদ্ধি ও তার গুরুত্ব

মাওলানা আল আমিন
সহকারী নাজিম, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা

কোরআনে আলাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجعَلُهَا لِلَّذِينَ لَاُيرِيدُونَ عُلُوًّافِى الاَرضِ وَلَافَسَادًا ؕ وَالعَاقِبَةُلِلمُتَّقِينَ

"এই পরকাল আমি তাদেরকে দান করব যারা পৃথিবীতে বড়াই করে না এবং ফেতনা ফ্যাসাদ বা অশান্তি সৃষ্টি করে না। আর শুভ পরিণাম শুধু খোদাভীরুদের জন্য।"

وقال عليه الصلاة والسلام.ان في الجسدلمضغة اذا صلحت سلح الجسد كله واذافسدت فسدالجسد كله الا وهى القلب

হাদিস শরীফে রাসুল ﷺইরশাদ করেনঃ নিশ্চয়ই মানবদেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে, যদি তা সুস্থ বা পবিত্র থাকে তাহলে সমস্ত দেহ থাকবে সুস্থ বা পবিত্র, আর যদি তা বিনষ্ট বা অপবিত্র হয় তাহলে সমস্ত দেহ হবে বিনষ্ট বা অপবিত্র। জেনে রাখ তা হল ক্বলব(অন্তর)।

আয়াত ও হাদিস শরীফের মধ্যকার সম্পর্ক হল যে, "আয়াতে বলা হয়েছে যারা পৃথিবীতে বড়াই বা অহংকার করে না, ফেতনা-ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে না, তাদের জন্য রয়েছে আখেরাত।আর হাদিসে বলা হয়েছে যে,মানুষের শরীরে একটি মাংসখণ্ড আছে তা ভাল হলে সমস্ত শরীর ভাল থাকে,আর তা খারাপ হলে সমস্ত শরীর হয় খারাপ। বুঝা গেল যে,যাদের অন্তর খারাপ তারাইতো পৃথিবীতে অহংকারের সাথে চলে এবং ফেতনা, ফাসাদ বা অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে।আর যাদের ক্বলব বা অন্তর ভাল তারাই পৃথিবীতে অহংকার করে না ও অশান্তি সৃষ্টি করে না। তাদের জন্য রয়েছে পরকালের অসীম শান্তি। অতএবঃ পরকালের সফলতা অর্জন করতে হলে অন্তরকে সুস্থ ও পবিত্র রাখতে হবে। ক্বলব সম্পর্কে আরও বুঝা দরকার যে,সমস্ত শরীরের ভাল মন্দ এই ক্বলবের উপরই নিভর্র করে।কেননা এই ক্বলবে যদি ঈমান থাকে তাহলে ব্যক্তি হয় ঈমানদার, আর ঈমানদারই হল আলাহ তায়া'লার একমাত্র পছন্দনীয় বান্দা।এমন কি আলাহ পাক নিজেই ঈমানদারদের অভিভাবক হয়ে যান।যেমন কোরআনে আছ الله ولي الذين امنوا অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে আলাহ পাক তাদের অভিভাবক। পক্ষান্তরে এই ক্বলবে যদি ঈমান না থাকে তাহলে ব্যক্তি হয় কাফের,মুশরেক,মুনাফেক,আর তারা হল আলাহ পাকের নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বান্দা।তাদেরকে কোরআনে কারীমে চতুস্পদ জানোয়ারের থেকেও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। আর তাদের অভিভাবক হল তাগুত,অর্থাৎ শয়তান। তাহলে ক্বালব যদি ভাল হয় তবে আলাহ হবেন অভিভাবক, ফলে সে ব্যক্তি হবে চিরস্থায়ী জান্নাতী। আর ক্বালব যদি খারাপ হয় তার মধ্যে যদি কুফর, শিরক,নেফাক থাকে তাহলে শয়তান হবে তার অভিভাবক ফলে সে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। এ থেকে বুঝা গেল, মানুষের জীবনের উত্থান-পতন,উন্নতি-অবনতি সবই এই মাংসপিণ্ড তথা ক্বলবের উপর নিভর্র করে। কিন্তু খুবই আফসোস আর পরিতাপের বিষয় হল যে,ক্বলব এত মূল্যবান হওয়ার পরও তার রোগ হলে তা থেকে তাকে অরোগ্য করার জন্য তাকে নির্মল ও পবিত্র রাখার জন্য, আমরা কতটুকু চেষ্টা তদবীর করে থাকি ? কিছুই করি না। অথচ দেখা যায় শারিরীক রোগ হলে তাতে চেষ্টা তদবীরের কোন ক্রটি হয় না।

মানুষের রোগ দুই প্রকারঃমানুষের রোগ দুই প্রকার। (১.) শারীরিক, (২.) মানসিক (যেটাকে আমরা ক্বালবী রোগ বলে থাকি)।শারীরিক রোগ যথা জ্বর,সর্দি,কাশি,ইত্যাদি। আর মানসিক রোগ যথা - কুফরী,শিরকী,নেফাকী ইত্যাদি। শরীরিক রোগে যদি মানুষ মারা যায় তাহলে জাহান্নামে যেতে হবে না। এমনকি কোন কোন রোগ শারীরিক রোগ তো এমনও রয়েছে যে, সে রোগে মারা গেলে জাহান্নামে যাওয়াতো দূরের কথা, বরং শহীদী দরজা নছীব হাওয়ার সুসংবাদ রয়েছে। যেমন- কলেরা,মহামারী, পেটের রোগ ইত্যাদি। কিন্তু এতদ্বসত্বেও আমরা একটু না একটু শারীরিক রোগ হতেই ডাক্তারের পরামর্শ নেই। আর একটু জটিল মনে করলে চারশত,পাঁচশত, ছয়শত টাকা দ্বারা প্রেসক্রিপশন করিয়ে থাকি। এবং ঔষধ ও অন্যান্য ব্যবস্হাপত্র করতে গিয়ে প্রচুর টাকা খরচ করে থাকি। এমনকি আরও জটিল মনে করলে হাজার হাজার টাকা খরচ করে বিদেশ গিয়ে চিকিৎসা করে থাকি।

মোটকথা, শারীরিক অবস্থা সুস্থ থাকার জন্য ইহ জগতে বেঁচে থাকার জন্য সর্বদাই আমরা সচেতন থাকি।খুবই সতর্কতার সাথে উঠা-বসা, চলাফেরা করে থাকি,যাতে করে শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয়ে না পড়ি। না জানি মরে যাই কিনা? অতচ এ রোগে মারা গেলে দোযখে যেতে হবে না। চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে না। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় যে,মানসিক রোগ দূরীকরণে আমাদের কোন পদক্ষেপ নেই। তা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য আমরা কোন প্রকার ব্যবস্হা গ্রহণ করিনা।

প্রিয় পাঠকগণ: একন আমাদের একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত যে,আমরা এ সমস্ত রোগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং এ সমস্ত রোগে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য কতটুকু চেষ্টা বা তদবীর করে যাচ্ছি? আফসোস।আমরাতো এ সমস্ত মহামারীর চিকিৎসক বা ডাক্তার কারা

তাদেরকেও চিনিনা, চিনার চেষ্টা ও করিনা।অথবা চিনে থাকলে তাদের দ্বারা প্রেসক্রিপশন করাইনা,আর প্রেসক্রিপশন করিয়ে থাকলে ঔষধ সংগ্রহ করিনা,সংগ্রহ করে থাকলে তা ব্যবহার করতে জানিনা।মোট কথা এ ব্যপারে আমরা তৎপর নই বরং উদাসীন। কিন্তু তৎপর হব এবং উদাসীন কেটে যাবে এমন এক দিন,যে দিন কোন তৎপরতা ও চতুরতা কাজে আসবে না। দুনিয়া থেকেই চতুর চালাক হয়ে এ সমস্ত মহামারী রোগের চিকিৎসা করে যেতে হবে। নতুবা আফসোসের সীমা থাকবেনা। যারা এমনটা করে যেতে পারবে তারাই হবে ভাগ্যবান। তারাই হবে সফলকাম।আর যারা হেলায় খেলায় দিন কাটিয়ে মারা যাবে তারা হল হতভাগা, বুদ্ধিহীন।তারাই মানবতার কলংক।তাদের জন্যই রয়েছে ভয়ানক আযাব,তারাই হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী-অনন্তকাল তারা সেথায় থাকবে।

"জীবন ডায়রী হচ্ছে তৈরি, হিসাব হবে কড়া।
মনে রেখো খোদার কাছে পড়বে একদিন ধরা।"

অহংকার পতনের মূলঃ প্রিয় পাঠকগন মানুষের মানসিক রোগের মধ্যে অহংকার ও একটি রোগ।মানসিক রোগ এত মারাত্মক যে, তা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,ব্যক্তির মধ্যে সরিষা বা তিল পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। অহংকার সম্পর্কে এক হাদিসে কুদছীতে আলাহ পাক ঘোষণা করেন ىادر ءايربكلا অর্থাৎ অহংকার আমার চাদর।সুতরাং যে ব্যক্তি অহংকার আর গর্ব করল,সে যেন আমার চাদর নিয়ে টানাটানি করল।স্বয়ং আলাহ পাকের চাদর নিয়ে টানাটানি করা, এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে? যেমন রাসুল ﷺ ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে এবং অহংকারের সাথে চলাফেরা করে সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আলাহপাকের সামনে এমন অবস্থায় উপনিত হবে যে আলাহ তার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন।

প্রিয় পাঠকগণ: অহংকার বা গর্ব একটি মারাত্মক ব্যাধি যা মানুষকে আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়, অস্থায়ী জিন্দেগীর লেপ-লালসা অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়ে স্হায়ী জিন্দেগীর কথা অন্তর থেকে মুছে দেয়।তাই এ রোগ থেকে আপ্রান বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। আর তা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বুজুর্গানে দ্বীনের সাহচর্যে থাকা এবং আলেম ওলামাদের জুতা সোজা করে দেয়া তাদের খেদমত করা ইত্যাদি। ছোট একটি ঘটনা মনে পড়েছে।

কোন এক ব্যক্তিকে অহংকারের সাথে চলতে দেখে তাকে একজন বুজুর্গ উপদেশ দিলেনঃ এভাবে চলোনা এভাবে চলা ঠিক নয়। বুজুগের্র কথায় সে ব্যক্তি আগুন হয়ে গেল এবং বলল

لَاتَدْرِيمَنْاَنَا

-তুমি জাননা আমি কে? সাথে সাথে বুজুর্গ উত্তর দিলেন,

اَوَّلُـكَ نُطْفَـةٌ قَـذِرَةٌ وَآخِـرُكَ جِيْفَـةٌ قَـذِرَةٌ وَاَنْـتَ بَيْـنَ ذٰلِـكَ تَحْمِـلُ العَذِرَةَ

আমিজানিতুমিকে?

তোমার শুরু হল ঘৃনিত অপবিত্র. এক ফোঁটানাপাক পানি আর তোমার জীবন শেষ প্রহরে তুমি হবে একটা পচা দুর্গন্ধময় মুর্দার, আর তার মধ্যবর্তী সময়গুলোতে তুমি হলে পেটের নাপাক মলমূত্র বহনকারী একটি জান।

প্রিয় পাঠকগন, বুজুগের্র কথা শুনে সে ব্যক্তি থমকিয়ে গেল। আর কথা বলার সাহস পেলনা। আসলেও সত্য, মানুষ কিনিয়ে অহংকার আর গর্ব করবে? আপন ইতিহাস জানা থাকলে কেহই গর্ব করতে পারেনা।

আলাহপাক আমাদের সকলের ক্বালবকে সকল প্রকার মানসিক রোগ থেকে হেফাজত করুন। আমিন!

যিনি বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধন করেন, তিনিই সর্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ।

আল-হাদিস

ইসলাম ও মানবাধিকার

হাফিজ মাওলানা ওলীউর রহমান হামিদী
সাহেবজাদায়ে শায়খে বর্ণভী

মানবাধিকার মানে মানুষের অধিকার। অর্থাৎ একজন মানুষ, মানুষ হিসাবে জন্মলাভ করার সুবাধে পরিবার, সমাজ, দেশ ওজাতির নিকট যেসব অধিকারের ন্যায্য দাবীদার হয়ে উঠে, তাকেই বলে মানবাধিকার। যেমন- জীবন ধারণের অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, সম্পদের অধিকার, নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অধিকার, স্বীয় মর্যাদার অধিকার ইত্যাদি।

আমাদের মধ্যে বিশেষতঃ আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, মানবাধিকারের স্বীকৃতি পশ্চিমা সভ্যতার অবদান। তার কারণ হল, পশ্চিমা বিশ্বের পদতলে মানবাধিকার যতই দলিত-মথিত হোক-না কেন, মূখ দিয়ে কিন্তু মানবাধিকারের শোগান তারা জোরে সোরেই বিশ্বব্যাপী শুনিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই শোগানের সূচনা হয় ১২১৫ সালে ৬৩ ধারা বিশিষ্ট "ম্যাগনাকার্টা" নামক সনদ হতে। যাতে মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়। তার পর ১৬২৮ সালে "পিটিশন অর-রাইটস" নামক আরেক সনদের ভিত্তিতে মানবাধিকারের প্রসঙ্গ আসে। অতঃপর ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের "ফিলাডেলফিয়ায়" অনুষ্ঠিত সম্মেলনে- আমেরিকান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা "বিল অব রাইটস" নামক সনদে এই বলে মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হল যে, সকল মানুষকেই সমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং স্রষ্টা মানুষকে স্বীয় জীবন স্বাধীনতা ও সুখ অন্বেষণের অধিকার দিয়েই সৃষ্টি করেছেন"। পরবর্তিকালে উক্ত ঘোষণার সাথে বাক স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি যোগ করা হয়। এর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার উপর যখন তৈরী হয় জাতিসংঘ তখন জাতি সংঘের উদ্যোগ তৈরী হয়- "জাতী সংঘ মানবাধিকার" সনদ আজকের দুনিয়া এই সনদের ভিত্তিতেই মানবাধিকার প্রশ্নে উচ্চকিত।

কিন্তু এতদসত্তেও এর পরের ইতিহাস শুধু মানবাধিকার লংঘনের ভয়াবহ কাহিনীতেই ভরপুর। ফিলিস্তিন, আজরাবাইজান, কাশ্মীর, আফগান, ইরাক, বসনিয়া, চেচনিয়া সহ আরো অসংখ্য দুর্বল জনপদে হায়েনার মতো হামলে পড়ছে সবলেরা। মানবাধিকারের ধ্বজাধারী পরাশক্তিগুলোর পায়ের নিচে পিষ্ট হচ্ছে আজ মানবাধিকার। মানবাধিকার সনদের প্রধান রচয়িতাদের এহেন কুকীর্তিতে দিশেহারা আজ বিশ্বের নিরীহ বনি-আদম।

অথচ আমরা যদি একটু ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, অন্ধকার পৃথিবীকে মানবাধিকার শিখিয়েছে ইসলাম। ইসলামই হচ্ছে মানবাধিকারের সূতিকাগার, ও এর অভিভাবকত্বের সর্ব প্রথম দাবীদার। ইসলাম শুধু মানবাধিকারের ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি- বরং সাথে সাথে বাতলে দিয়েছে এর প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ বাস্তবনীতি। যত্নের সাথে এসব অধিকার গুলোকে লালন করেছে, এবং সেগুলো বিকাশের উপযোগী পরিবেশসৃষ্টি করে মানুষের ব্যক্তিত্বে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এসব অধিকারকে প্রকৃত ভূমিকা পালনকরতে দিয়েছে। এবং এর লংঘনকারীদের জন্য রাষ্ট্রীয় আদালতে মামলার পাশাপাশি দিয়েছে পরকালীন জীবনে ভয়ংকর শাস্তির ঘোষণা। যা দুনিয়ার মামলা মোকদ্দমার চাইতে অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী এবং কার্যকর। আজকের-মানবাধিকার সনদ গুলোর হাজারো বছর পূর্বে ইসলাম যখন পৃথিবীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠারভূমিকা নেয়, তখন পৃথিবী ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল মূর্খতার যুগ। মানবাধিকারে অন্যান্য নিয়ম-নীতি দূরে থাক এর প্রথম কথা মানুষের বাঁচার অধিকারের ছিলনা কোন গ্যারান্টি। এমনকি আপন পিতার নিকট স্ত্রী-কন্যাদেরও ছিলনা প্রাণের নিরাপত্তা। সাম্য ভ্রাতৃত্ব আর সামাজিক শৃংখলা এমন ভাবে পদদলিত ছিল, সামান্য অজুহাতেও চলত গোত্রে গোত্রে শতাব্দী ব্যাপী লড়াই। মহিলাদের ভোগের বস্তু ছাড়া কিছুই ভাবা হতনা। ছিলনা সমাজে তাদের সামান্যতম মর্যাদা- অধিকার। কিন্তু ইসলাম সেই সমাজে এসে ঘোষণা দিল, মানুষ সবই সমান।

ভাষা, গোত্র, বর্ণ, কিংবানারী-পুরুষ সকলেই সমঅধিকারী এক আদমের সন্তান। প্রত্যেকে ইজান, মাল, ইজ্জত, আর ধর্মীয় বিশ্বাস রক্ষার অধিকার রয়েছে। অর্থ, বিত্ত, বংশ, মর্যাদা, কিংবা শরীরের চামড়ার রং এসব কিছুই সম্মান-প্রাপ্তির কারণ হতে পারেনা। একমাত্র সৎকর্ম বলে যেকোন ব্যক্তি স্রষ্টার নিকট সবচাইতে বেশী সম্মানের অধিকারী হতেপারে।

পবিত্র কোরআনে আলাহপাক এরশাদ করেন "হে মানবজাতি আমিই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে সৃষ্টি করেছি।

এবং পরস্পরকে চেনার জন্য জাতি- গোত্র হিসেবে বিভক্ত করেছি। "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই আলাহর নিকট অধিক সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশী নীতি পরায়ন"। (সূরাআল-হুজরাত, আয়াত-১৩)। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও পারস্পারিক সমতা বিধানের এমন বলিষ্ট ঘোষণা দেড়হ-াজার বছর পূর্বেইমানবজাতীর সামনে পেশ করেছে, ইসলাম। প্রিয়নবী (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ হজ্বের ঐতিহ-াসিক বিদায়ী যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তার তাৎপর্য বিশেষণ করলে দেখা যায় যে, আজকের মানবাধিকার সনদগুলোর মূল কথাগুলোই সেদিন তিনি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। যেমন- জীবন ও সম্পদের অধিকারসম্পর্কে বলেছিলেন "আজকের এইদিন, এইমাস এবং এই শহর যেমন তোমাদের নিকট পবিত্র, তোমাদের জীবন ও ধন সম্পদ ও তেমনি তোমাদের নিকট পবিত্র। কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করা বৈধ নয়"। এখানে মানুষের জীবন ও সম্পদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আজকেরমানবাধিকার সনদ বা (টউঐজ)-এর ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- প্রতিটি মানুষেরই বেঁচে থাকার অধিকার তথা জীবন ধারণের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছিলেন- "তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে, যেমনি তাদের উপর ও তোমাদের অধিকার রয়েছে" মানবাধিকার সনদের ১৬ এবং ২৩নং অনুচ্ছেদে স্বামী-স্ত্রীর অধিকারবিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন এবং ভঙ্গ হওয়ার সময় প্রত্যেকেরই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছিলেন- "সমস্ত মুসলমান পরস্পরের ভাই" তাঁর এই বক্তব্যে ইসলামী ভাতৃত্ববোধ কে বহু উচ্চে স্থান দেয়া হয়। তিনি বলেছিলেন সকল মানুষই এক আদমের সন্তান এবং সবাই মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী। শ্রেষ্টত্ব অর্জনের মাধ্যম পরহেজগারী। মানবাধিকার সনদের ১ম অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সকল মানুষের উচিৎ একে অন্যের সাথে ভ্রাতৃত্ব-সুলভ আচরণকরা। এছাড়াও মহানবী (সাঃ) সেদিন দাস-দাসীদের প্রতিমর্যাদা প্রদর্শন করার কথা বলে কৌলিন্য প্রথাকে বাতিল করেছিলেন। অন্যায় ভাবে মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ করে জীবন ধারণ স্বাধীন-তা ও নিরাপত্তার কথা বলেছিলেন। আর মহানবী (সাঃ)-এর সেদিনকার এ অমূল্য কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, মানবাধিকারের প্রকৃত স্বরূপ। মানবাধিকারের প্রথম যে কথা, সেটা হচ্ছে মানুষের বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করা। তারপর হল অন্যান্য বিষয়। কিন্তু আজকের বিশ্বের মানবাধিকারের প্রথম এ মূলনীতিটিই তথাকথিত মানবা-ধিকারের এজেন্টদের হাতে লংঘিত হচ্ছে চরমভাবে। আজ মানুষ হত্যা নিজের ক্ষমতা প্রমাণের একমাত্র মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আলাহ্পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন- "রহমানের বান্দা তারাই যারা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেনা এমনটি করলে তাদেরকে দেয়া হবে নির্মম শাস্তি (সূরাফোরকান)। এজন্যেই কোন মুসলমান অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে, সেজন্যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে ইসলাম। এরই নাম সমতা আর তারই নাম মানুষের বাঁচার অধিকার সংরক্ষণ করা।

অতএব, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামই হচ্ছে মানবাধিকারের ধর্ম, মানবাধিকারের সুতিনাগার ও তার রক্ষক। অস্ত্র, অর্থ, ক্ষমতা আর প্রোপাগান্ডা দিয়ে নয়, বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একমাত্র ইসলামী নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমেই।

অসত্যের দাপট ক্ষণস্থায়ী
কিন্তু সত্যের গৌরব চিরস্থায়ী।
হযরত সোলাইমান আ.

তালিবুল ইলমদের রামাজান

মুফতি আবু ইউসূফ চৌধুরী

মুহতামিম খাদিজাতুল কুবরা (রা) মহিলা মাদ্রাসা নবীগঞ্জ

রমজান দ্বারপ্রান্তে । পবিত্র এই পূন্যমাস আসার আগেই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রস্তুতি ছাড়া কোন কাজই ঠিকভাবে করা যায়না। যার প্রস্তুতি যত ভালো তার ফলাফলও তেমন ভালো হয় ঈর্ষণীয় হয় । সফল প্রস্তুতিই সাফল্যের স্বর্ন শিখরে পৌছাতে সহায়তা করে । রমজান হলো নিজেকে বিনির্মানের মাস , ঈমানকে প্রাণবন করার মাস । তাই যার প্রস্তুতি উত্তম হবে তিনি ততো মুল্যায়িত হবেন। প্রশ্ন হলো এই প্রস্তুতি কীসের ? লজ্জা ও হতাশার হলেও বাস্তবতা হল ,প্রস্তুতি বলতে অনেকে খানাপিনার আয়োজনকে গন্য করেন।কী কী কিনতে হবে , ইফতারী-তে কি কি আইটেম থাকবে , কেমন বাহারী আয়োজন হবে এইসব নিয়েই বেশি ব্যাস্ত থাকেন।রমজানের ঈদকে কেন্দ্র করে আবার গনমাধ্যমে শুরু হয় নানা ধরনের প্রস্তুতি। এসব প্রস্তুতিতে রামাজান বা ঈদ শুধু উপলক্ষে ব্যাবসাটাই তাদের মুখ্য । এজন্য শুরু হয় ঈদ সংখ্যা , ঈদ আয়োজন , ঈদ ফ্যাশন শো ও ঈদ বিনোদনের নামে রমাজানের চেতনা ও বার্তাবিরোধী সব আয়োজন। এসবের রামাজা-নের ম্যাসেজের, উদ্যেশ্যের ছিটেপোটাও থাকেনা ।

রমজান এলে দেশে সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই সাধারন ছুটি পালন করা হয়। বিশেষত মাদরাসার একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে।রমাজানের দীর্ঘ ছুটিকে তারা নিজেকে বিনির্মানে কাজে লাগাতে পারে। অনেকেই এটা করেও । তবে কেউ কেউ আবার ছুটিকে "গোল্লাছুটে" কাটিয়ে দেয়। তারাই গনমাধ্যমের রমজান বানিজ্যের ভোক্তা হয়ে যায়।সাংস্কৃতি আর বিনোদনর নামে অমূল্য আর সৌভাগ্যের পরশ মাসকে হেলায় কাটিয়ে দেয় । অথচ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে রমজানের কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়েছে , সে সকল প্রকার কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।সুতরাং স্থায়ী ও নিশ্চিত কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়ে দুনিয়ার সামান্য বিনোদন তালিবুল ইলমদের উদ্দেশ্য হতে পারেনা। আল্লাহর ইবাদতে সময় পার করা এবং তাতে মগ্ন থাকার মত আনন্দ আর কিসে হতে পারে । নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন রামজান মাসে ফেরেতোরা রোজাদারে জন্য মাগফেরাত কামনা করতে থাকেন । রমজান মাসে শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয় । এ মাসে জান্নাতের দুয়ার সমুহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমুহ বন্ধ করে রাখা হয় । মিশকাত শরীফ, হাদিস নং ১৯৬২। অন্য এক বর্ননায় আছে নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন " আল্লাহ তায়ালার কাছে রোজাদারের মুখের গন্ধ মেশকে আম্বরের চেয়ে উত্তম । সহিহ বুখারী ও মুসলিম মিশকাত শরীফ হাদিস নং ১৯৫৯ । আর এ মাসেই হাজার মাসের চেয়ে উত্তম , হাজার দিনের চেয়ে শ্রেষ্ট একটি রাত রয়েছে । যে এ রাত থেকে বঞ্চিত থাকে সে সকল প্রকার কল্যান থেকে বঞ্চিত হবে। মিশকাত হাদিস নং ১৯৬২

এরকম আরো কত বৈশিষ্ঠ দিয়ে দিয়ে আল্লাহ রমজানকে শুভামন্ডিত করেছেন । সকল মাস থেকে তাকে শ্রেষ্ট করেছেন । এ মাসে আমল কারীকে আল্লাহ দ্বিগুণ সওয়াব দান করেন । যে সকল ফযিলত দিয়ে এ মাস কে মর্যাদাবান করেছেন সে গুলো নিয়ে এখানে আলোকপাত করা হলো ।

এই সকল আলোচনা তাদের জন্য বেশি জরুরি যারা এখনো তালিবুল ইলম।যারা এখনো শিখছেন , তারা কিভাবে রমজান কাটাবেন কী করবেন তা এখনই নির্ধারন করা জরুরী । সারা বছরই প্রাতিষ্টানিক পড়ালেখা নিয়ে ব্যাস্ত থাকায় আমলি জিন্দেগির জন্য বিশেষ ও বর্ধিত সময় বের করা অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনা।

তারা রমজানকে গনিমত হিসেবে নিতে পারেন। রমজানকে জীবন ধারনের জিয়ন কাঠি করতে পারেন । কারন রমজানই পারে আক্ষরিকভাবে একজন তালিবুল ইলমকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌছতে বিনির্মান করে দিতে ।

কুরআনের মাস: এ মাসে কুরআন অবতির্ন হয়েছে । রমজান এলে হুজুর (সাঃ) ও জিবরাইল (আঃ) একে অপরকে কুরআন পড়ে শুনাতেন । হযরত উসমান রাঃ রমজানের দিনে একবার কুরআন খতম করতেন । ইমাম শাফেয়ী (রহ.) রমজানে ষাট খতম কুরআন পড়তেন।সু-বহানাল্লাহ. তাবেয়ী কাতাদাহ (রা.) সব সময় সাত দিনে এক খতম কুরআন পড়তেন,আর সে মেহনত হতে পারে তিন ভাবে।

এক: তালিম পর্যায়ে । অর্থাৎ যারা সহিহ শুদ্বভাবে কুরআন পড়তে জানেন , তারা সর্বত্র কুরআনের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে এর ব্যাপক সচেষ্ট হবেন।

দুই: তায়াল্লুম বা শিক্ষা করা । যারা শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করতে জানেন না তারা রমজানকে সুবর্ন সযোগ হিসাবে কাজে লাগাতে পারেন।এই সময়ে শিখে নিতে পারেন ।

অন্য হাদিসে নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন,যে ব্যক্তি রমজান মাসে নিজের গোনাহ মোচন করাতে পারল না তার মত দুর্ভাগা আর কেউ নাই। মিশকাত ১৯৬৮

হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন , একবার রাসুল সাঃ আমাদের শাবান মাসের শেষ তারিখে বয়ান করলেন এবং বললেন হে লোক সকল তোমাদের প্রতি ছায়া বিস্তার করছে একটি মহান মাস বরকতময় মাস,তাতে একটি রাত রয়েছে হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ট। এ মাসে আল্লাহ রোজাকে ফরজ করেছেন,কিয়ামুল লাইল কে নফল করেছেন । যে ব্যক্তি এই মাসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল আদায় করবে সে ওই ব্যক্তির মত হবে যে এইমাসে একটি

ফরজ আদায় করে । আর যে ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরজ আদায় করে সে ওই ব্যক্তির মত হবে যে এ মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করে । এটি একটি দীর্ঘ হাদিস যা মিশকাত ও বাইহাকিতে বর্ননা করা হয়েছে ।

সদাক্বার মাস : নবী করীম সাঃ ইরশাদ করেন, সবচেয়ে উত্তম সাদাক্বাহ হলো রমজান মাসের সাদাক্বাহ । বুখারীর এক রেওয়ায়েত বর্নিত আছে হুজুর সাঃ ছিলেন সবচেয়ে বেশী দানশীল,রমজান মাসে তার দান আরো বেড়ে যেত,তার দান প্রবাহিত বাতাস অপেক্ষা বেশী ছিল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, তোমরা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগী হও । আমাদের ও সাহাবিদের মত এমন প্রতিযোগিতা নিয়ে ইবাদত করতে হবে। তাদের পথ অনুসরন করতে হবে। রমজানে যেহেতু তালিবুল ইলমরা অনেকটা অবসরে থাকে এজন্য তাদের উচিৎ ভাল কাজে সহ পাঠিদের সাথে আমল নিয়ে প্রতিযোগিতা করা।

ইখলাস ফিল আমলের মাস:ইখলাস ফিল আমল নিয়েসবার সচেতনতা অবলম্বন করা উচিত। আমলে যদি খুলুসিয়্যাত না থাকে তাহলে সকল আমলই বাতিল হয়ে যাবে । নবী করিম সাঃ ইরশাদ করেন, এমন কিছু রোজাদার আছে যার রোজার কষ্ট ছাড়া আর কিছু নেই , এমন কিছু রাত্রি জাগরন কারী রয়েছে যার রাত্রি জাগরনে নির্ঘুম ছাড়া আর কিছুই নেই ।মিশকাত ২০১৪ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন যে ব্যাক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রমজান মাসের রোজা রাখে তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে । মিশকাত ১৯৫৮

রমজান মাস আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য অনেক বড় নেয়ামত এবং উপহার এ মাসে রয়েছে অনেক অনেক অফার । অল্প আমলে প্রচুর সাওয়াব লাভের সুযোগ, আর রহমতের বারিধারা তো আছেই । নবী করিম সাঃ ইরশাদ করেন যখন রমজান মাস আসে আকাশের দ্বার সমুহ খুলে দেওয়া হয় । অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে জান্নাতের দ্বার সমুহ খুলে দেওয়া হয় , জাহান্নামের দ্বার সমুহ বন্ধ করে দেয়া হয়, এবং শয়তানকে বন্দি করা হয় । বুখারী মুসলিম মিশকাত , হাদিস নং ১৮৬০

রমজানকে বলা হয় ইবাদতে বসন্তের মাস । মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এই বিপুল পরিমান নিয়ামতের অফার পেয়ে মুমিনের ঘুমন্ত হৃদয় যেন সজিবতা ফিরে পায়।

রমজান প্রস্তুতি ১: রমজানে অধিক গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো গোনাহ থেকে বিরত থাকা , কেননা গোনাহ রোজাকে হালকা করে দেয় । আমরা যত গোনাহ করি তার মধ্যে প্রচলিত ও মারাত্মক গোনাহ হল গীবত বা পরনিন্দা করা। রমজান আসার পূর্ব থেকে সবসময় চেষ্টা থাকতে হবে , গীবত থেকে বিরত থাকার। রমজানে ভুলেও যেন আমরা এ কাজটি না করি।

রমজান প্রস্তুতি ২: আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া এবং নামাজের মধ্যে মনোযোগি হওয়া। সর্বোপরি নামাজের প্রতি যত্নবান হবো।

রমজান প্রস্তুতি ৩: ইসলামের রোকন পাচটি : কালেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্ব । এ পাচটি রোকনের মধ্যে নামাজ ও রোজায় আমরা এহতেমাম করলেও যাকাত বা সদকার প্রতি আমরা খুবই উদাসিন ।নফল নামাজ ও রোজা করলেও নফল সদকা খুব একটা করা হয়না । তাই রমজান মাসে এই এবাদত থেকেও যেন বঞ্চিত না হই এখন থেকেই সামর্থ পরিমান জমা করতে থাকি ।সদকার সওয়াবের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন , যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করে তাদের দান ঐ দানার মত যা থেকে সাতটি চারা বের হয়। এবং প্রত্যেকটি চারায় থাকে একশো দানা । আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা আরো বাড়িয়ে দেন । সূরা বাক্বারা ,২৬১

রমজান প্রস্তুতি ৪: কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআনের যে অংশগুলো মুখস্ত করা হয়েছে তা ইয়াদ করা। ইয়াদ করে করে সেগুলো নামাজেও পড়তে হবে প্রতিদিন কিছু অংশ তাফসির ও পড়া যেতে পারে। চেষ্টা করব মুখস্ত আয়াতের অর্থ ভালোভাবে আয়ত্ব করার এবং তাফসির পড়ার। কিছু তাফসির পড়ব (যারা তাফসিরের মূলনিতি জানেনা তাদের তাফসির না পড়াই ভালো) । পড়া ইয়াদ করব। খতমের জন্য তেলাওয়াত করবো। ইনশাআল্লাহ

সৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো আতর ওয়ালার মতো, তুমি আতর না নিলেও তার সুভাস পাবে।

বুখারী শরীফ

শিক্ষকের মর্যাদা

মাষ্টার ইউনুছ আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা

শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে ওঠার পেছনে বাবা-মা'র যেমন অবদান থাকে; শিক্ষকেরও তেমন থাকে বৃহৎ ভূমিকা।আলাহ তাআলা শিক্ষকদের আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন। তাদের সম্মানে ভূষিত করেছেন। ফলে মুসলিমসমাজে শিক্ষক-মাত্রই বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের ব্যক্তি।শিক্ষাকে যাবতীয় উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হলে, শিক্ষকের ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। বলতে গেলে এর বিকল্প নেই।

পবিত্র কোরআনে নাজিলকৃত প্রথম আয়াতে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাসংক্রান্ত কথা বলা হয়েছে। আলাহ তাআলা বলেন, 'পড়! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু জমাট রক্ত থেকে। পড়! আর তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত। যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।' (সুরা আলাক, আয়াত ১-৫) প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা জ্ঞান অর্জন করো এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য আদব-শিষ্টাচার শেখো। এবং যার কাছ থেকে তোমরা জ্ঞান অর্জন করো, তাকে সম্মান করো।' (আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস ৬১৮৪) । রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন কর।সমাজে শিক্ষকদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার ঐতিহ্য ও রীতি বেশ প্রাচীন। শিক্ষা অনুযায়ী মানবচরিত্র ও কর্মের সমন্বয় সাধনই হচ্ছে রাসুলুলাহ (সা.)-এর তাগিদ। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'আলাহর পরে, রাসূলের পরে ওই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা মহানুভব যে জ্ঞানার্জন করে ও পরে তা প্রচার করে।' (মিশকাত শরিফ) ,জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) একবার তার সওয়ারিতে (বাহন) ওঠার জন্য রেকাবে (সিঁড়িতে) পা রাখলেন। তখন ইবনে আব্বাস (রা.) রেকাবটি শক্ত করে ধরলেন। এ সময় জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বললেন, হে রাসুল (সা.)-এর চাচাতো ভাই, আপনি হাত সরান। উত্তরে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, না, আলেম ও বড়দের সঙ্গে এমন সম্মানসূচক আচরণই করতে হয়। (আল ফকিহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২১৯৭)খেলাফতের যুগেই ইসলাম প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে তখন শিক্ষকের জন্য সম্মানজনক পারিশ্রমিকও নির্ধারণ করা হয়েছিল। যদিও দ্বীনি শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষকরাকেবল আলাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান বিতরণ করতেন।

আর তারা যেহেতু নিজেদের জীবিকার পেছনে ব্যতিব্যস্ত সময় পার না করে, শান্ত-সৌম্য মস্তিষ্কে জ্ঞান বিতরণের পবিত্র কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাই তৎকালীন খেলাফত ব্যবস্থা বা সরকার তাদের সম্মানে অভিষিক্ত করেছিলেন। তাদের জ্ঞান বিতরণের এ মহৎ কাজকে সম্মান জানিয়ে তাদের পরিবার-পরিজনের যাবতীয় আর্থিক খরচ বহন করেছিলেন। যেন জীবনের তাগিদে শিক্ষকদের ভিন্ন কোনো পথে পা বাড়াতে না হয়।

একজন প্রাজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সত্যিকারভাবে শিক্ষক সমাজ বদলে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। আদর্শ শিক্ষকই শুধু আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করতে পারেন। জ্ঞানই মানুষের যথার্থ শক্তি ও মুক্তির পথনির্দেশ দিতে পারে।এ মর্মে নবী (সা.) ইরশাদ করেন, 'দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও পদ গৌরব লোভনীয় নয়। তা হলো-১. ধনাঢ্য ব্যক্তি, যাকে আলাহ ধনসম্পদ দান করেছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন; ২. ওই ব্যক্তি, যাকে আলাহ বিদ্যা দান করেছেন এবং সে অনুসারে সে কাজ করে ও অপরকে শিক্ষা দেয় (বুখারি : ৭১)।একজন শিক্ষক বাবার মর্যাদাস্থলে থাকেন, তাই শিক্ষকের জন্যও উচিত তিনি নিজের সন্তানকে যেভাবে ভালোবাসেন তার শিক্ষার্থীকেও যেন সেভাবেই ভালোবাসেন। হজরত আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস রা. নিজের ছাত্রদের সম্পর্কে বলেছেন, তাদের চেহারায় একটি মাছি বসলেও আমি কষ্ট পাই। -(তাজকিরাতুস সামে, ৯)

ধৈর্য ও নামাজ যাবতীয়
সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকার

হাফেজ মাওলানা রশিদুল ইসলাম ফারুক্বী

يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ

ইরশাদ হচ্ছে হে মুমিন! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য পার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (বাক্বারা ১৫৩)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দুটি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত। একটি সবর বা ধৈর্য এবং অন্যটি নামাজ। যে কোন প্রয়োজনেই এ দুটি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। সঙ্গত কারনেই স্বতন্ত্রভাবে দুটি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

সবর এর তাৎপর্যঃ সবর শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম ও অবলম্বন ও নফস এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রন লাভ। অর্থাৎ কাম-ক্রোধ,মোহের উত্তেজনা, পাওয়ার আশা আকাঙ্খা, না পাওয়ার দুঃখ শোক, আনন্দ-উচ্ছাস ইত্যাদিতে ভাবাপন্ন না হয়ে বরং স্বাভাবিক অবস্থায় সব কিছুকে বরণ করে নেয়ার নামই সবর বা ধৈর্য।

কোরআন ও হাদীসে সবরের তিনটি শাখার উল্লেখ রয়েছে। যথা-১ নফ্সকে হারাম এবং নাজায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা। ২ এবাদত এবং আনুগত্যে বাধ্য করা ৩ যে কোন বিপদ-আপদ উপস্থিত হলে, সে গুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা,অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোন কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়, কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়,তবে তা সবর এর পরিপন্থী নয় (ইবনে কাসীর)

আবার কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন, ধৈর্য দুই প্রকার ১ নিজের কাজের উপর ধৈর্য্যাবলম্বন। এটা আবার দুই প্রকার যথা (ক) স্বীয় করণীয় সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ প্রসস্ত মনে সম্পাদন করা এবং (খ) তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে অম্লান বদনে বিরত থাকা।

২। যে কাজ বান্দার আয়ত্বাধীন নয়। তাতে ধৈর্য ধারণ করা যে কাজ বান্দার আয়ত্বাধীন নয়, তাতে ধৈর্য ধারণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট এবং বিপদ আপদ অবতীর্ণ করেন, তাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করা।

"সবর" এর উপরোক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য । কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্য ধারণ কারী সে সমস্ত লোককেই বলে যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই "সবর" অবলম্বন করে। আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে ধৈর্য ধারন করা এক মাত্র মানুষের কাজ। অন্য কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ এ বৈশিষ্ট দান করেন নি। ফেরেস্তাকুলের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলে ও তাঁর কাম–বাসনা ,লোভ লালসার উর্ধ্বে। অন্যান্য প্রাণী কুলের কাম-বাসনা ,লোভ লালসা রয়েছে কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা নেই। মানব জাতীর মধ্যে কাম–বাসনা এবং জ্ঞান বুদ্ধি উভয়টি বিদ্যমান। যখন উভয়টি পরস্পর সাংঘর্ষিক হবে,তখন উক্ত সংঘর্ষ প্রতি হত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানব জাতীকে "সবর" এর বৈশিষ্ট দান করেছেন।

"সবর" এর মর্যাদা অসীম। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন সত্তর অথবা পচাত্তর স্থানে "সবর" এর কথা উল্লেক করেছেন কোরআনে কারীমের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নেক আমলের জন্যে নির্ধারিত প্রতিদান রয়েছে, কিন্তু সবর এর প্রতিদান অনির্ধারিত, সীমাতীত। আল্লাহ বলেনঃ (অর্থ) সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসাবে প্রধান করা হবে।

যারা বিপদাাপদে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের সাথী ,বন্ধু। যেমন- আল্লাহ বলেন "নিশ্চই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন"। এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে এক ব্যক্তি হুজুর সা. এর খেদমতে এসে নিবেদন করলেন , ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে এবং স্বাস্থ্যহানীর দরুন আমি অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পড়েছি। হুজুর সা. বললেন যদি কারও ধন সম্পত্তি নষ্ট না হয় এবং রোগ না হয়, তবে তার কোন পূণ্য কাজই সুষ্ঠরূপে সম্পন্ন হয় না, কেননা আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্ধাকে বন্ধুর মর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বিপদ আপদ ও দুঃখ কষ্ট দিয়ে ধৈর্য্যাবলম্বনের শিক্ষা লাভ করেন।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা গেল ধৈর্য্যধারণকারীর সাথী বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ। আর যে ব্যক্তির বন্ধু বা সাথী আল্লাহ, তার সম্মুখে দুনিয়ার কোন সংকট কিংবা শক্তি টিকতে পারেনা। তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারও থাকে না।

নামাজঃ মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে নামাজ। সবর এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে সর্ব প্রকার এবাদতই সবর এর অর্ন্তভূক্ত। তথাপি নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, নামাজ এমনই একটা ইবাদত, যাতে সবর তথা ধের্যের পরিপূর্ন নমুনা বিদ্যমান। কেননা নামাজের মধ্যে একাধারে যেসব নফস তথা রুহকে আনুগত্যে বাধা রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সর্বপ্রকার বিপদ মুক্তি এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে নামাজের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এটা পরিক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে নামাজ আদায় করলে যেমন বিপদ মুক্তি অবধারিত, তেমনি তেমনি যে কোন প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে,অত্যাচারী শাসক যখন হযরত সারা আ. কে

পাকড়াও করেছিল তখন ইব্রাহিম আ. নামাজে লিপ্ত হয়েছিলেন আল্লাহ তাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছি-লেন। এমনি ভাবে রাসূল সা. এর পবিত্র অবভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হতেন, তখনই নামাজ আরম্ব করতেন। আর আল্লাহ তায়ালা সে নামাজের বরকতেই তার যাবতীয় বিপদাপদ দূর করে দিতেন।

নামাজী কুলির কাহিনীঃ

কথিত আছে যে, কুফা নগরে একজন জনপ্রিয় বিশ্বাসী কুলি ছিল। ব্যবসায়ীরা তার মাধ্যমে তাদের মালামাল এক শহর থেকে অন্য শহরে প্রেরণ করত। একবার সেই কুলি কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একজন লোকের সাথে সাক্ষাত হলে লোকটি কুলীর গন্তব্যস্থল জেনে বলল আমিও সেখানে যাব। তবে পায়ে হেটে যাওয়া আমার পক্ষে একটু অসম্ভব। আপনি যদি দয়া করে খচ্চরের উপর ছওয়ার করে নেন, তাহলে কেরায়া স্বরূপ আপনাকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিব, খচ্চরের উপর আরোহন করে লোকটি যখন একটি দ্বিমুখি রাস্তার মোড়ে পৌছিল, তখন কুলীকে জিজ্ঞাসা করল ভাই কোন পথে যাবে। কুলী পরিচিত রাস্তার কথা বললে লোকটি বলল অন্য পথে গেলে অল্প সময়ে যাওয়া যাবে্ তদুপরি খচ্চরের জন্য এই পথে প্রচুর ঘাসেরও ব্যবস্থা রয়েছে। কুলী বেচারা অন্য পথে গিয়ে দেখল সে পথটি একটি ভয়ংকর জংগলের মাথায় শেষ হয়েছে এবং সেখানে অনেকগুলি মৃত দেহ পড়ে রয়েছে। উক্তস্থানে পৌছা মাত্রই আরোহি ব্যক্তি কচ্চর থেকে নেমে খঞ্জর বের করে কুলিকে হত্যা করতে উদ্যত হল। কুলি বেচারা খচ্চর এবং সমস্থ ধন সম্পদের বিনিময়ে জীবন ভিক্ষা চাইল। কিন্তু পাষন্ড লোকটি বলল আমি কসম করে বলছি যে প্রথমে তোমাকে হত্যা করব তারপর সব লুণ্ঠন করব। কুলি নিরুপায় হয়ে বলল আমাকে আমাকে শেষ বারের মত দু রাকাত নামাজ পড়তে দাও। লোকটি বলল তারাতারি পড়ে নাও। কিন্তু মনে রেখ ঐ সমস্ত মৃতদেহরাও শেষে নামাজ পড়েছিল, তবে নামাজ তাদেরকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি। কুলি বেচারা নামাজ আরম্ব করল, কিন্তু কোন আয়াত তার মনে আসছিল না। ওদিকে দস্যু লোকটি তারা তাড়া দিচ্ছিল । এই চরম সংকটময় মুহুর্তে হঠাৎ তার মুখ থেকে এই আয়াত উচ্চারিত হল " আম্মান য়ুযীবুল মুযত্বাররা"। অর্থ কে সে যে বিপদ গ্রস্থকে সাহায্য করবে? (নিশ্চই তিনি একমাত্র আল্লাহ)

কুলি ক্রন্দন করতে করতে এই আয়াত পাঠ করছিল। হঠাৎ উজ্জল লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত একজন আরোহি সেখানে এসে বল্লমের সাহায্যে দস্যু লোকটিকে হত্যা করে দিল। সে জালিমের মৃত দেহ দাউ দাউ করে জ্বলছিল। নামাজরত কুলি তখন সেজদায় পড়ে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করল। অত:পর দৌড়ে গিয়ে আরোহিকে জিজ্ঞাসা করল, দয়া করে বলুন আপনি কে? কেমন করে আসলেন তিনি বললেন তুমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছ আমি তার গোলাম । এখন তুমি নিরাপদে যথা ইচ্ছা যেতে পার। এই বলে তিনি চলে গেলেন। (নুজহাতুল মাজালেছ) আল্লাহপাক আমাদের নামাজ এবং সবর এর মাধ্যমে তার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যাবতীয় প্রয়োজন এবং সর্ব প্রকার সংকট উত্তরণের তাওফিক দান করুন (আমিন)

যিনি বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধন করেন, তিনিই সর্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ।

আল-হাদিস

কবিতা কানন

জ্বলছে ফিলিস্তীন

মাওলানা মাহমুদুল হাসান

দাবানলের অগ্নিশিখা জ্বলছে ফিলিস্তীনে
ঘূর্ণিঝড়রে বেগ বাড়ছে দিনে দিনে।
নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু পাচ্ছে না কোনো কূল
ঝরনার মতো রক্ত ঝরছে ভেবে পাই না কূল।
কাঁদে আকাশ, কাঁদে বাতাস, কাঁদে অচিন পাখি
শত মায়রে কোল খালিতে অশ্রুসজল আঁখি।
দাঁড়াও দাঁড়াও হে মুসলিম তাদের পাশে দাঁড়াও
ঈমানী শক্তি তাজা রাখতে হাত দুটোকে বাড়াও।

হুজুরের লেখালেখি

হাঃসাইফুলইসলাম

হুজুর হয়ে লিখি আমি
এটাই আমার দোষ!
আমার লেখা ছাপবেনা তাই
দেখায় বড় জোশ।
দিলটা তাদের শক্ত বড়ই
জাফলং এর পাথর ফেইল!
প্রোফাইল পিকে হুজুর দেখে
তাই খুলে না আমার মেইল।
যোগ্যতা বা মেধা বল
যতই আমার থাকে,
পাক-ভারতের বর্ডার যেন
তাদের চোখে আকেঁ।
ভয় পেয়ে যায় মোলা দেখে
না জানি হায় কি হয়!
জীবন শুরু কিংবা শেষে
তারাই কথা কয়।
চোখটা খুলে দেখনা চেয়ে
আমরা কোথায় থাকি,
বলতে গেলে ভরবে পাতা
থাকবে কি আর বাকি!
ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে
আমরা সবাই লিখি,
দিনের বেলায় চাদেঁর আলো
পানির মত দেখি।

নতুন সাজে

হাঃ আজিজুর রহমান

মুর্খতার লোকের সমাহারে
নিমজ্জিত ছিলো চারদিকে,
রবের কথা ভুলে তারা
লাতের কাছে যেতো দুঃখে।
তাদের তুমি দিশা দিতে
আসলে ধরার এই মাজে,
কুফর-শিরক বিলিন করে
গড়লে ধরা নতুন সাজে।
পুলকিত বিশ্ব বুকের
সব মাখলুকাত যত,
তুমি আসায় এরা সবাই
প্রভুর সেজদায় রত।
সৃষ্টিকুলের সেরা মানব
তুমি বিশ্বনবী,
তুমি বিনে ইয়া নফছি
বলবে আদম !সবি।

জামেয়ার ইতিবৃত্তান্ত

ভূমিকা:
ইসলাম হচ্ছে মানবজাতীর একটি পরিপূর্ণ সংবিধান। আর ইসলাম ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর মাঝে যত ধর্ম আছে সব ভ্রান্ত ও মানব রচিত জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ পাকের নিকট এগুলোর সামান্য পরিমাণও মূল্য নেই। তাই মহান আল্লাহ পাক সূরা আলে ইমরানে বলেন- নি:সন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো একমাত্র ইসলাম। আল্লাহর হাবিব রাসুলে আরাবী (সা:) বলেছেন, ততক্ষন পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবেনা- যতক্ষণ পর্যন্ত একজন বান্দাও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। (আল হাদিস)।
তাই যে শিক্ষায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করনে ওয়ালা তৈরি করে সে শিক্ষাই আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন। মানব রচিত শিক্ষা কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনা।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য:
অত্র এলাকার মুসলমানদের,তথা বাংলা ভাষাবাসীছোট ছোট বাচ্চাদের দ্বীনী শিক্ষা প্রদান, ও একই সাথে বয়স্কদের মধ্যে দ্বীনী চিন্তা চেতনার প্রচার-প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম ভিত্তিক মসজিদকে আমলের দ্বারা আবদ্ধ করাই হলো উক্ত জামেয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

নামকরণ:
ইংল্যান্ড প্রবাসী এবং বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হাদিয়ে মিল্লাত কুতুবে জামান আল্লামা হাফেজ শায়খ ইউসুফ মুতালা (রহ.) এর নির্দেশে এবং আরো অনেক উলামায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এর নামানোসারে জামেয়া ফারুক্বীয়া, উক্ত মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়- জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা।

অবস্থান:
হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলাধীন কাজীগঞ্জ বাজার রোডে তাজপুর (মাদবপুরে), নিরিবিলি ও কুলাহলমুক্ত পরিবেশে ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান।

প্রতিষ্ঠাকাল:
সিলেটের সুনামধন্য বুজুর্গ পীরে কামেল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আমিন উদ্দিন শায়খে কাতিয়া (রহ.) আল্লামা উব্দুল মুমিন শায়েখে ইমামবাড়ী ও আল্লামা তাফাজ্জুল হক মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জী, হযরত মাওঃ আব্দুর রহমান (শায়খে ধুলিয়া), হজরত মাওঃ জমির উদ্দিন সাহেব, শায়েখে জালালপুরী ও হজরত মাওঃ আব্দুল মান্নান, শায়েখে গুনই (রহ.) উনাদের উপস্থিতিতে ভিত্তি প্রস্থর প্রতিষ্টা হয়। ১৯ শে জানুয়ারী ২০০৪ সনে উক্ত জামেয়ার সূচনা হয়।

প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল:
হবিগঞ্জ জেলার সুনামধন্য ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, নবীগঞ্জ নয় মৌজার গৌরবময় কৃতিত্বপূর্ণ ব্যক্তি লন্ডন প্রবাসী, হযরত শাহ জালাল লিড্স মসজিদের সাবেক ইমাম ও খতিব হযরত মাওলানা শায়খ আবু তাহের ফারুকী (দা.বা.)। নিজস্ব সাড়ে ৪ কেদার জমিনের উপর এই জামেয়াটি প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সামনের পূর্ব দিকে আরো নিজ ৬ কিয়ার জমির উপর দুটি ফিসারী অবস্থিত আছে, ও ঘোলডুবা ২ টি পরিবারের ২ বিঘা জমিতে মসজিদ সহ মোট সাড়ে ১২ কিয়ার জমির উপর জামেয়া ও মসজিদপ্রতিষ্টিত। এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সকল প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব নিজ হাতে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, উলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের পরামর্শক্রমে।আল্লাহ তায়ালা যেন এ সমস্ত দ্বীনী কাজ গুলোকে এখলাসের সাথে আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দান করেন আমিন।

প্রতিষ্ঠানের নাম	: **জামেয়া ফারুকীয়া তাজপুর মাদরাসা**
স্থাপিত	: ২০০৪ ইংরেজি
অবস্থান	: তাজপুর, কাজীগঞ্জ বাজার, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম	: শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুকী
নায়েবে মুহতামিম	: হাফিজ মাওঃ মুশতাক আহমদ ফারুকী
শিক্ষা বিভাগ	: হিফজ বিভাগ, নাযেরা বিভাগ,কিতাব বিভাগ (মক্তব পাঞ্জম পর্যন্ত) নুরানী বিভাগ [নার্সারী থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত
শিক্ষাবোর্ড	: বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ আযাদ দ্বীনি এদ্বারা বোর্ড সিলেট। হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নুরানী তালিমুল কোরআন বোর্ড, বাংলাদেশ
শিক্ষাবর্ষ	: শাওয়াল-শাবান
শিক্ষক	: ১০ জন।
কর্মচারী	: ৩ জন
ছাত্র	: ২০০ জন।
ভর্তি	: ৮ শাওয়াল হতে শুরু।

জামেয়ার বৈশিষ্ট্যঃ

>> মেধাবী ছাত্রদেরকে মাত্র ২ বছরে হিফজ সমাপ্ত।
>> নূরানী পদ্ধতিতে মাত্র ৩ বছরে প্রাইমারী শিক্ষা সমাপ্তি।
>> আবাসিক ছাত্রদের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত খাবার খাওয়ার সুব্যবস্থা।
>> পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দেওয়ার ব্যবস্থা।
>> ইবতেদায়ী পঞ্চম ও হিফজ তাকমিলের ফাইনাল বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধা ইবতেদায়ী ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত।
>> আবাসিক-অনাবাসিক (আবাসিক ছাত্রদের জন্য ২৪ ঘন্টার নেগরানি) মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তি পুরস্কার প্রদান।
>> মেধা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক ইজলাস এর ব্যবস্থা।
>> জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা।
>> দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পাঠদান।
>> সার্বক্ষনিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা তত্বাবধান।

যোগাযোগ : ০১৭২৬০২২৭৭৮, ০১৭৫৬৪৭৮৭৫

যে সমস্ত মনিষিদের পদচারনায় জামেয়া ধন্য

১। খলিফায়ে মাদানী আল্লামা আ: মুমিন শায়খে ইমামবাড়ী (রহ.)
২। আল্লামা আমীন উদ্দিন শায়খে কাতিয়া (রহ.)
৩। আল্লামা তাফাজ্জুল হক মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জী (রহ.)
৪। হযরত মাও. জমির উদ্দিন সাহেব শায়খে জালালপুরী (রহ)।
৫। হযরত মাও. আব্দুল মান্নান শায়খে গুনই (রহ.)।
৬। শেখ আব্দুর রহমান, শায়খে ধুলিয়া রহ.
৭। শায়খ আব্দুল মন্নান দত্তগ্রামী রহ.
৮। শায়খ আব্দুল হক, গাজিনগরী রহ.
৯। মাওলানা মুখলিছুর রহমান কিয়ামপুরী
১০। মাও. সৈয়দ ফজলুল করীম, পীর সাহেব চরমোনাই।
১১। মাও. উবাইদুল হক সাহেব (রহ.)। খতিব বায়তুল মুকার্‌রাম
১২। মাও. মুহি উদ্দিন খান সাহেব (রহ.)। (মাসিক মদিনা)
১৩। মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া (রহ.)।
১৪। মাও. মুহিব্বুল হক গাছবাড়ী (রহ)।
১৫। মাও. মুফতি তালেবুদ্দিন সাহেব (রহ)।
১৬। মাও. নুরুদ্দিন সাহেব (রহ.), খতিব, বাইতুল মুকার্‌রাম।
১৭। মাও. ক্বারী বেলায়েত সাহেব (রহ.)।
১৮। মুফতি আব্দুল হান্নান সাহেব, সভাপতি, ইউরোপ জমিয়ত।
১৯। মাও. রশিদুর রহমান ফারুক বর্ণভী ।
২০। মাও. মুহসিনুল হক শায়খে কৌড়িয়া।
২১। মুফতি সাইফুল ইসলাম সাহেব, ইউকে।
২২। মুফতি জুনাইদ আহমদ সাহেব।
২৩। মাও. ফজলুর রহমান বানিয়াচঙ্গী।
২৪। মাও. ইমাম উদ্দিন সাহেব।
২৫। জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী, সাবেক এম.পি
২৬। জনাব শেখ সুজাত মিয়া সাবেক এম.পি
২৭। জনাব শাহ নেওয়াজ মিলাদ গাজী সাবেক এম.পি
২৮। জনাব মুনিম চৌধুরী বাবু সাবেক এম.পি
২৯। জনাব তোফাজ্জুল হক, সাবেক মেয়র নবীগঞ্জ উপজেলা
৩০। জানাব আলমগীর চৌধুরী, সাবেক নবীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান
৩১। জনাব ফজলুল হক চৌধুরী সেলিম,সাবেক নবীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান
৩২। জনাব ছাবির আহমদ চৌধুরী, মেয়র নবীগঞ্জ উপজেলা
৩৩। জনাব মুজিবুর রহমান চৌধুরী সেফু,সাবেক নবীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান
৩৪। জনাব সাইফুল জাহান চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান নবীগঞ্জ উপজেলা

ষান্মাসিক

ফারুক্বী পয়গাম

Faruqi Poygam

৪র্থ সংখ্যাজুমাদাল উলা ১৪৪৫ হিজরি। নভেম্বর ২০২৪ ইংরেজি

জামেয়ার একাডেমিক ভবন

মসজিদে উমর ফারুক রা.

জামেয়ার প্রধান ফটক

জামেয়ার হিফজ বিভাগ

JAMIA FARUQIA TAJPUR NABIGANJ HABIGANJ

প্রতিষ্ঠাতা: শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুক্বী

E-mail : Jamiafaruqia@hotmail.com | mataherfaruqi@hotmail.com

মোহাম্মদিয়া টেইলার্স
এন্ড ক্লথ স্টোর
প্রোঃ হাজী আবু সুফিয়ান
01737-490975
উন্নত মানের দেশি বিদেশী শার্টিং স্যুটিং
প্যান্টিং ও পাঞ্জাবীর কাপড় বিক্রয় করা হয় ।
কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মার্কেট
মধ্যবাজার নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ ।

ক্রিয়েটিভ ডিজাইন নিখুঁত প্রিন্টিং
আমাদের সেবা সমূহঃ
ডিজিটাল ব্যানার, ফেস্টুন
সাইন বোর্ড, স্টিকার, মার্বেল পাথর
নামাজের সময়সূচী, সিল, স্বরণিকা
পোস্টার, লিফলেট, ভিজিটিং কার্ড
ক্যালেন্ডার, ক্রেস্ট প্রিন্ট, মগ প্রিন্ট
আইডি কার্ড, বিয়ের কার্ড, গ্রাফিক্স
ডিজাইন সহ যাবতীয় ছাপা ও
স্ক্রীন প্রিন্টের কাজ করা হয় ।
ক্রেস্ট প্রিন্ট
টি-শার্ট প্রিন্ট
মগ প্রিন্ট
Ad Corner
Graphics & Sign
OLY AHMED
Proprietor:
Ad Corner Graphic & Sign
+8801709 545 787
+8801719 022 361
facebook/ad corner
adcorner.nj@gmail.com

১৯৯১থেকে
সৌরভ আর্ট
এন্ড ডিজিটাল প্রিন্ট সাইন
প্রোঃ হাফিজ আহমেদ চৌধুরী
সাবেক শিক্ষক,
আরমান উল্লাহ ইসলামিক একাডেমী এন্ড হাই স্কুল
01715 60 04 84
01785 05 56 10
shawrovart@gmail.com
ওসমানী রোড, উপজেলা সংলগ্ন নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।